ইসলামের রুকনসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

المختصر في شرح أركان الإسلام

কতিপয় ছাত্র

অনুবাদক: আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المختصر في شرح أركان الإسلام

بعض طلبة العلم

ترجمة: عبد الله المأمون الأزهري

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

অভিমত

আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর অফুরন্ত নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করার সুযোগ প্রদান করেন এবং তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি দান করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিই সত্য ইলাহ্, যিনি ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। তিনি তাঁর রিসালাত যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন ও দীনের আমানত আদায় করেছেন । আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁর হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবীগণ সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত। তারা আল্লাহর শরী'আত ধারণ করে তদানুযায়ী আমল করেছেন এবং পরবর্তী লোকদের কাছে যথার্থভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। সালাত, সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। আর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবীর ওপর এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে যথার্থ অনুসরণ করবে তাদের ওপরও। অতঃপর....

আমি কিছু তালিবে ইলমের লিখিত ইসলামের পাঁচ রুকন সম্পর্কিত এ গুরুত্বপূর্ণ বইটি পড়েছি। আর তা হচ্ছে, দুই শাহাদাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ। এ পাঁচটি রুকন অধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণে সংক্ষিপ্তাকারে এগুলো আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য ইবাদত এখানে উল্লেখ করা হয় নি। কেননা এ পাঁচটি রুকন দৈনন্দিন ব্যবহৃত, সকলের জানা অত্যাবশ্যকীয়, অনেক মানুষই এ সম্পর্কে অজ্ঞ, ইসলামী নামধারী অনেক রাষ্ট্রই এ আমলগুলো বাস্তব প্রয়োগ করার ব্যাপারে উদাসীন, এ সম্পর্কে অনেকের সঠিক জ্ঞানের অভাব, এ সম্পর্কে মানুষকে দিক-নির্দেশনা ও সতর্ক করার যোগ্যলোকেরও অভাব, তাছাড়া তারা যতটুকুও জানে তাতে

রয়েছে ভুলত্রুটি, সংযোজন ও বিয়োজন। নিঃসন্দেহে কোনো মুসলিম যদি এসব আরকান যথাযথভাবে ও পরিপূর্ণরূপে জীবনে প্রয়োগ করে তাহলে তা তার জন্য দীনের বাকী কাজগুলো বাস্তবায়ন করা সহজ করবে এবং তাকে সেদিকে ধাবিত করবে। ফলে সে আকীদা বিষয়ে গুরুত্বারোপ করবে, হালাল কামাই অর্জনে উৎসাহিত করবে, গুনাহের কাজ থেকে দূরে রাখবে এবং ইসলামের আদব ও আখলাকে চরিত্রবান হবে। ইসলামের পাঁচটি আরকান গুরুত্বপূর্ণ এ বইটিতে সংক্ষিপ্তভাবে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় জনসাধারণের উপযোগী করে বর্ণিত হয়েছে। বইটিতে আলেমদের মতানৈক্য উল্লেখ না করে আমাদের কাছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে যা প্রতীয়মান হয়েছে সে মতটিকেই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে যদিও অন্য কেউ অপর মতটি পছন্দ করে থাকে। কারণ, মতভেদ এবং বহু মতামত উল্লেখ করার কারণে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। মানুষ যদি সত্যনিষ্ঠার সাথে কোনো একটি মাস'আলার দলিলসহ হুকুম জানে ও আমল করে তাহলে এতেই তারা সাওয়াবের অধিকারী হবে, গুরুত্বহীনতা ও ত্রুটির শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তাই কল্যাণকামী লোকদের কাছে অনুরোধ তারা যেন এ ধরণের বই মুসলিম বিশ্বে সকলের কাছে পৌঁছে দেন, যাতে মুসলিমগণ তাদের দীনের ব্যাপারে জেনে-শুনে আমল করতে পারেন। আর কেউ ভালো কাজের পথ নির্দেশ করলে সে উক্ত কাজটি সম্পন্নকারীর সাওয়াবের মতোই সাওয়াবের অধিকারী হবেন। অনুরূপভাবে কেউ হিদায়াতের দিকে আহ্বান করলে যারা সে হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব আহ্বানকারী পাবেন; অথচ আমলকারীদের সাওয়াবের কোনো কমতি হবে না। যারা বইটি লিখেছেন, প্রকাশ করেছেন ও সহযোগীতা করেছেন আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর আল্লাহ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর সালাত ও সালাম নাযিল করুন।

২৩/০১/১৫১৪হি:

আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন জিবরীন

ফতোয়া বিভাগের সদস্য

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, তাঁর কাছে আমাদের অন্তরের সব কলুষ ও আমাদের কৃত সব পাপ থেকে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই, আর যাকে ভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াত প্রদানকারী কেউ নেই। আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর আল্লাহ সালাত, সালাম ও বরকত নাযিল করুন তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার পরিজন, পবিত্র সহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের সকল অনুসারীর ওপর।

অতঃপর....

ইসলামের পাঁচ রুকন তথা ‘লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সাওম পালন করা ও বাইতুল্লাহর হজ করা নিয়ে এ সংক্ষিপ্ত বইটি লিখিত। এতে কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও ‘ইজমার আলোকে দলিলসহ আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহকে সূরার দিকে এবং হাদীসগুলোকে বিখ্যাত হাদীসের কিতাবসমূহের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বইটিতে আমরা পাঠকের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে প্রধান শিরোনামে এবং আনুষঙ্গিক বিষয়কে উপ-পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, এতে বিষয়ভিত্তিক তথ্য পেতে পাঠকদের সুবিধা হবে। আমরা পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত মূল বই থেকে ইলমী বিষয়বস্তু একত্রিত করেছি এবং পাঠকের পড়ার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাস করেছি।

নতুন সংস্করণে বেশ কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

১- শাহাদাতাইনের শর্তাবলী-

২- অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতার পদ্ধতি-

৩- ফরয সালাতের পরে নিয়মিত পড়া সুন্নত সালাত ও বিতর সালাত

৪- অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের পদ্ধতি

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন এ বইটিকে সাধারণ মুসলিমের উপকারে আনেন। তিনি মহা দয়ালু। আমাদের সর্বশেষ কথা হলো, সকল প্রশংসা রাব্বুল ‘‘আলামীন আল্লাহ তা‘আলার জন্য।

প্রথম রুকন

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

ইসলামের প্রথম রুকন হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-কে মনে প্রাণে সাক্ষ্য দেওয়া। আর এ সাক্ষ্যের সাথে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ উল্লেখ করা হোক বা না হোক উক্ত রুকনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এটি দীন ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাত বিষয়। এ ব্যাপারে কোনো মুসলিম কখনোই মতানৈক্য করে নি।

নিচের কয়েকটি ধাপে গুরুত্বপূর্ণ এ রুকন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর নামসমূহ

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ রুকনটি অনেক নাম রয়েছে, যেগুলো এর অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। তন্মধ্যে ‘কালেমাতুত তাওহীদ’ (তাওহীদের কালেমা), ‘কালেমাতুল ইখলাস’ (একনিষ্ঠতার কালেমা), ‘কালেমাতুশ শাহাদাহ (একত্ববাদের সাক্ষ্যের কালেমা)’ ও ‘কালেমাতুল হক (সত্যের কালেমা)’ অন্যতম।

দ্বিতীয়ত: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর রুকন

কালেমা তাওহীদের প্রধান দু’টি রুকন রয়েছে। তা হলো:

ক- নাফী তথা নেতিবাচক। এটার উদ্দেশ্য হলো ‘লা ইলাহা’ (সব প্রকারের ইলাহকে অস্বীকার করা)।

খ- ইসবাত তথা ইতিবাচক। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে সাব্যস্ত করা।

অতএব, কালেমায়ে শাহাদাতের মূল অর্থ হলো, আল্লাহ ব্যতীত সব মা‘বুদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই উলুহিয়্যাত সাব্যস্ত করা, তার সাথে কাউকে শরীক না করা। শাহাদাতের এ অর্থে উপরোক্ত দু’টি রুকন সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যথা:

১- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦﴾ [البقرة: ٢٥٦]

“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, সাঈদ ইবন জুবায়ের, দাহহাক রহ.-এর মতে, উপরোক্ত আয়াতে ٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ দ্বারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য বুঝানো হয়েছে।

আর তাগূত হলো বান্দা কর্তৃক একমাত্র মা‘বুদ ও অনুসরণকৃত সত্তার সীমা অতিক্রম করে অন্য কিছুর ইবাদত করা এবং সে মা‘বুদ ও অনুসরণকৃত সত্তা এতে সন্তুষ্ট থাকা।

অতএব, উক্ত আয়াত দু’টি রুকন প্রমাণ করে। তাগূতকে অস্বীকার করা ও একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা। আর এটাই কালেমা শাহাদাহ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর মর্মকথা।

২- আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٣٦﴾ [النحل: ٣٦]

“আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা জমিনে ভ্রমণ কর অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

এ আয়াতও পূর্বের আয়াতের ন্যায় কালেমা শাহাদাতের অর্থ বহন করে।

৩- আল্লাহ তা‘আলা ‘আদ জাতির ভাষায় বলেছেন,

﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِنَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَحۡدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٧٠﴾ [الاعراف: ٦٩]

"তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করি এবং ত্যাগ করি আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার ইবাদাত করত? সুতরাং তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও'।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৬৯]

হূদ আলাইহিস সালামের দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٦٥﴾ [الاعراف: ٦٤]

"আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৬৪]

এখানে ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থেই। এমনিভাবে নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণীও একই অর্থ প্রমাণ করে,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

"আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি পাঠাই নি যার প্রতি আমি এ অহী নাযিল করি নি যে, 'আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর"। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম তাদের উম্মতকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কালেমার দিকে আহ্বান করেছেন। তারা প্রধানত দু'টি বিষয় উম্মতকে বুঝিয়েছেন ও তাদেরকে এ পথে আহ্বান করেছেন,

প্রথমত: একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করা। এটি এ আয়াতে لِنَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَحۡدَهُۥ ইসবাত রুকন বা একচ্ছত্র আল্লাহর ইবাদত সাব্যস্ত করণ।

দ্বিতীয়ত: নাফী রুকন তথা আল্লাহর সাথে সব ধরণের শির্ক মুক্ত রাখা। এটি তাদের এ কথা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا "এবং ত্যাগ করি আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার ইবাদাত করত"।

৪- সহীহ মুসলিমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এ কথা বলে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তবে তার জান-মাল নিরাপদ। আর তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে"।[1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তবে তার জানমাল নিরাপদ। আর তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে"।[2]

এ হাদীসে নেতিবাচক রুকন তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত: কালেমা শাহাদাহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর হাকীকত ও অর্থ:

কালেমা শাহাদাহর হাকীকত ও অর্থ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও সম্পূরক। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩।

[2] ইবন হিব্বান, হাদীস নং ১৭১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৫৮৭৫। আল্লামা শু'য়াইব আরনাউত হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।

ক- ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার একত্ব: একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য তালাশ করা এবং শুধু তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

১- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَدۡعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٠﴾ [الجن: ٢٠]

"বলুন, নিশ্চয় আমি আমার রবকে ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না"। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২০]

২- আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٞ كَمَا يَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا ٤٢﴾ [الاسراء: ٤٢]

"বলুন, তাঁর সাথে যদি আরো উপাস্য থাকত, যেমন তারা বলে, তবে তারা 'আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছার পথ তালাশ করত"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৪২]

৩- আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ٥٧﴾ [الاسراء: ٥٧]

"তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর 'আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের 'আযাব ভীতিকর"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৭]

৪- আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ٣٧﴾ [فصلت: ٣٧]

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা না সূর্যকে সাজদাহ করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সাজদাহ কর যিনি

এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত কর”। [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৭]

৫- আল্লাহর বাণী,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٢﴾ [الانعام: ١٦٢]

“বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৬২]

৬- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿۞وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٢٢﴾ [لقمان: ٢٢]

“আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই কাছে”। [সূরা লুকমান, আয়াত: ২২]

খ- যাবতীয় শির্ক থেকে আল্লাহকে মুক্ত রাখা: বান্দা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অলী তথা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে না। যারা আল্লাহর শত্রু তাদেরকেও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে না। এ ব্যাপারে দলীল হলো নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ:

১- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٨﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٨]

“আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, ‘তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর, নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। তবে (তিনি ছাড়া) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি আমাকে শীঘ্রই হিদায়াত দিবেন। আর এটিকে সে তার উত্তরসূরীদের মধ্যে এক চিরন্তন বাণী বানিয়ে রেখে গেল, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করতে পারে”। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৮]

২- আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাষায় বলেছেন,

﴿قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ۝٧٥ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ ۝٧٦ فَإِنَّهُمۡ عَدُوّٞ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٧٧﴾ [الشعراء : ٧٥، ٧٧]

"ইবরাহীম বলল, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, তোমরা যাদের পূজা কর। তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা? সকল সৃষ্টির রব ছাড়া অবশ্যই তারা আমার শত্রু"। [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৭৫-৭৭]

৩- আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ۝١ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ۝٢ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ۝٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ۝٥ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ۝٦﴾ [الكافرون: ١، ٧]

"বলুন, হে কাফিরগণ, তোমরা যার 'ইবাদাত কর আমি তার 'ইবাদাত করি না এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হব না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন"। [সূরা আল-কাফিরূন, আয়াত: ১-৭]

৪- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۝٢٢﴾ [المجادلة: ٢٢]

"তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করতে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচ দিয়ে

ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম”। [সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ২২]

৫- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينًا ١٤٤﴾ [النساء : ١٤٤]

“হে মুমিনগণ, তোমরা মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিপক্ষে কোনো স্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত করতে চাও?” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৪]

৬- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾ [المائدة: ٥١]

“হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৫১]

গ- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে হাকেম বা বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ না করা:

বান্দা কর্তৃক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এমনভাবে আইনদাতা ও বিধানদাতা হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না, যার হালাল করা বিষয় সে গ্রহণ করবে এবং তার হারাম করা বিষয় সে বর্জন করবে। বরং কেবলমাত্র আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাই বান্দাহর জন্য হালাল। আর তিনি যা হারাম করেছেন তাই বান্দাহর জন্য হারাম। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে অসংখ্য দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

১- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٞ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ ١١٤﴾ [الانعام: ١١٤]

“আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন। আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানত যে, তা তোমার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১১৪]

২- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التوبة: ٣١]

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের[1] রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]

৩- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٢١﴾ [الشورى: ٢١]

“তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাব”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২১]

৪- আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

---

[1] এ স্থলে أحبار দ্বারা ইয়াহূদীদের ধর্মপণ্ডিত আর رهبان দ্বারা নাসারাদের ধর্মপণ্ডিতদেরকে বুঝানো হয়েছে।

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ٦١ فَكَيۡفَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّآ إِحۡسَٰنٗا وَتَوۡفِيقًا ٦٢ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُل لَّهُمۡ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَوۡلَۢا بَلِيغٗا ٦٣ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ٦٠، ٦٥]

“তুমি কি তাদেরকে দেখ নি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার ওপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা আসো যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে’, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে। সুতরাং তখন কেমন হবে, যখন তাদের ওপর কোনো মুসীবত আসবে, সেই কারণে যা তাদের হাত পূর্বেই প্রেরণ করেছে? তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করা অবস্থায় তোমার কাছে আসবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছু চাই নি। ওরা হলো সেসব লোক, যাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও। আর তাদেরকে তাদের নিজদের ব্যাপারে মর্মস্পর্শী কথা বল। আর আমি যে কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়। আর যদি তারা- যখন নিজদের প্রতি যুলম করেছিল

তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পেত। অতএব, তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০-৬৫]

৫- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤﴾ [المائدة: ٤٤]

"নিশ্চয় আমরা তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, এর মাধ্যমে ইয়াহূদীদের জন্য ফয়সালা প্রদান করত অনুগত নবীগণ এবং রব্বানী ও ধর্মবিদগণ। কারণ, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করো না। আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৪]

চতুর্থত: কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর শর্তাবলী:

কালেমা শাহাদাহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর কতিপয় শর্ত রয়েছে, যা জানা ও সে অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেকটি মুসলিমের ওপর ফরয। কুরআন ও সুন্নাহ পরিসংখ্যান ও গবেষণা করে এসব শর্ত বের করা হয়েছে।

১- ইলম বা জ্ঞান:

কালেমা শাহাদার প্রথম শর্ত হলো, ইলম বা জ্ঞান। এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [محمد : ١٩]

"অতএব জেনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই"। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯]

সহীহ মুসলিমে উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[1]

এখানে 'ইলম' বা জ্ঞান দ্বারা কালেমা শাহাদার দু'টি অংশ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর প্রকৃত ইলমকে বুঝানো হয়েছে। এ ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য যা কিছু অত্যাবশ্যকীয় করে সব কিছুই এখানে উদ্দেশ্য। আর ইলমের বিপরীত হলো জাহল বা অজ্ঞতা, অজানা ও নির্বুদ্ধিতা। এ উম্মতের মুশরিকরা (ইসলাম গ্রহণের পরেও যারা শির্কে লিপ্ত) ইলমের প্রকৃত অর্থ না জানার কারণেই তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর বিপরীত কাজ করে। তারা 'ইলাহ' শব্দের হাকীকী অর্থ, 'ইসবাত' ও 'নফি' এর মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রকৃত অর্থ না খুঁজে এর শাব্দিক অর্থকে বুঝিয়ে ইচ্ছাকৃত এ কালেমার অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ মুশরিকরাও এর প্রকৃত অর্থ জানত। যেমন তারা বলত:

﴿أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ﴾ [ص : ٥]

"সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে"? [সূরা সদ, আয়াত: ৫]

তারা আরো বলতো,

﴿أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمۡۖ﴾ [ص : ٦]

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬।

“যাও এবং তোমাদের উপাস্যগুলোর ওপর অবিচল থাক”। [সূরা সাদ, আয়াত: ৬]

২- ইয়াকীন:

ইয়াকীন হলো সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা ও দোদুল্যমান কোনো একটাকে গ্রহণ না করে মাঝামাঝি স্থানে বিরত থাকা বা নিছক সন্দেহ-সংশয় ইত্যাদির বিপরীত। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর প্রকৃত অর্থ হলো, নিঃসন্দেহে দৃঢ়তার সাথে মনে প্রাণে এ কালেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনা করা এবং একমাত্র আল্লাহকে প্রকৃত ইলাহ হিসেবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী হিসেবে মেনে নেওয়া, আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সব ইলাহকে অস্বীকার করা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যারা নবী দাবী করে তাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করা। কোনো ব্যক্তি যদি কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্’ এর অর্থ ও চাহিদার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকার করে বা অন্যের ইবাদত থেকে বিরত না থাকে; তবে এ দু’টি কালেমা তার কোনো উপকারে আসবে না। এ শর্তের দলীল হলো, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতাইন সম্পর্কে বলেছেন,

«لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

“যে কোনো বান্দা এ দু’টি বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।[1]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭।

“এ দেওয়ালের পেছনে যার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, যে আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসে এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও”।[1]

তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের প্রশংসা করে বলেছেন,

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ﴾ [الحجرات: ١٥]

“মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করে নি।”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৫]

পক্ষান্তরে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের নিন্দা করে বলেছেন,

﴿ وَٱرۡتَابَتۡ قُلُوبُهُمۡ فَهُمۡ فِي رَيۡبِهِمۡ يَتَرَدَّدُونَ ٤٥﴾ [التوبة: ٤٥]

“আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা তাদের সংশয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৫]

আব্দুল্লাহ ইবন মাস’উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ: وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ»

“সবর (ধৈর্য) হলো ঈমানের অর্ধেক আর ইয়াকীন হলো পূর্ণাঙ্গ ঈমান”।[2]

তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি শাহাদাতাইনের প্রকৃত অর্থে দৃঢ় বিশ্বাস করবে, তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে একমাত্র রাব্বুল আলামীনের ইবাদত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যই প্রকাশ পাবে।

৩- কবুল করা (গ্রহণ করা) যা প্রত্যাখানের বিপরীত

অর্থাৎ অনেক মানুষ কালেমা শাহাদাতের অর্থ জানে ও বুঝে এবং এর চাহিদাও ইয়াকীনের সাথে বিশ্বাস করে; কিন্তু অহংকার ও হিংসার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করে। এটি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান আলেমদের অবস্থা। কেননা তারা এক

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১।

[2] মু‘জাম আল-কাবীর, লিত-ত্ববরানী, হাদীস নং ৮৫৪৪, ৯/১০৪; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩৬৬৬, ২/৪৮৪। হাকিম রহ. হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী রহ.-ও সহীহ বলেছেন, তালখীস (৩৬৬৬)।

আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে সাক্ষী দেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে জানেন, যেমনিভাবে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে, তা সত্বেও তারা এ সত্যকে গ্রহণ করে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿ حَسَدًا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ ﴾ [البقرة: ١٠٩]

"সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশতঃ (তারা এরূপ করে থাকে)"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০৯]

এমনিভাবে মুশরিকরাও কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ জানত এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করত; কিন্তু তারা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তা প্রত্যাখান করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন,

﴿إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ٣٥﴾ [الصافات : ٣٥]

"তাদেরকে যখন বলা হত, 'আল্লাহ ছাড় কোনো (সত্য) ইলাহ নেই', তখন নিশ্চয় তারা অহঙ্কার করত"। [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿فَإِنَّهُمۡ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ٣٣﴾ [الانعام: ٣٣]

"কিন্তু তারা তো তোমাকে অস্বীকার করে না; বরং যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৩৩]

৪- আল-ইনকিয়াদ তথা বশ্যতা স্বীকার বা মেনে নেওয়া:

কবুল (গ্রহণ করা) ও ইনকিয়াদ (বশ্যতা স্বীকার করা) এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, ইনকিয়াদ মানে কর্মের মাধ্যমে কোনো কিছুর মেনে নেওয়া প্রকাশ করা। আর কবুল হলো, কথা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে কোনো কিছুকে সঠিক বলে গ্রহণ করা এবং তা প্রকাশ করা। উভয়টিই অত্যাবশকীয়। তন্মধ্যে ইনকিয়াদ হলো কায়মনোবাক্যে মেনে নেওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা, আনুগত্য করা এবং আল্লাহর

বিধানের অমান্য না করা ও যেভাবে বিধান এসেছে ঠিক সেভাবে অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ﴾ [الزمر: ٥٣]

“আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে নিজকে সমর্পণ কর।”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ﴾ [النساء : ١٢٥]

“আর দীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজকে পূর্ণ সমর্পণ করল”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৫]

﴿وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ﴾ [لقمان: ٢٢]

“আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে।” [সূরা লোকমান, আয়াত: ২২]

একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদতই হলো ইনকিয়াদের প্রকৃত অর্থ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনকিয়াদ হলো, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা কবুল করা, অনুসরণ করা এবং তাঁর বিচারে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء : ٦٥]

“অতএব, তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

এ আয়াতে তাদের ঈমানের সঠিকতার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালাকে পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেওয়া শর্ত করা হয়েছে। অতএব, তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব বিধান নিয়ে এসেছেন

সেগুলোতে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করা ও পূর্ণ সম্মতিতে সেগুলোর অনুসরণ করা অপরিহার্য।

৫- সত্যবাদিতা

এর বিপরীত হলো মিথ্যাবাদিতা। ঈমানের এ শর্ত সম্পর্কে সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"যে ব্যক্তি অন্তরের সত্যবাদিতার সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিবে, এ অবস্থায় মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[1]

পক্ষান্তরে কেউ যদি মুখে এ সাক্ষ্য দিল; কিন্তু অন্তরে এর মর্ম অস্বীকার করল তাহলে তার এ সাক্ষ্য কোনো কাজে আসবে না এবং সে নাজাতপ্রাপ্তও হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মৌখিক সাক্ষ্যের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ١﴾ [المنافقون: ١]

"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী"। [সূরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত: ১]

মুনাফিক ও কাফিরদের মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨﴾ [البقرة: ٨]

"আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি'; অথচ তারা মুমিন নয়"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮]

---

[1] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২২০০৩, শু'আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

৬- ইখলাস বা একনিষ্ঠতা

এর বিপরীত হলো শির্ক। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ۝٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ﴾ [الزمر: ٢، ٣]

“অতএব, আল্লাহর ‘ইবাদাত কর তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২-৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ۝١١﴾ [الزمر: ١١]

“বলুন, ‘নিশ্চয় আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি যেন আল্লাহর ইবাদাত করি তাঁর-ই জন্য আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿قُلِ ٱللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصٗا لَّهُۥ دِينِي ۝١٤﴾ [الزمر: ١٤]

“বলুন, ‘আমি আল্লাহর-ই ইবাদাত করি, তাঁরই জন্য আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ করে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৪]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ»

“কিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত লাভে সবচেয়ে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে খালিস অন্তরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (পূর্ণ কালেমা তাইয়্যিবাহ) বলে”।[1]

আর এটি ‘ইতবান ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে অর্থের পরিপূরক, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৯।

“আল্লাহ তা‘আলা তো এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই) বলে”।[1]

অতএব, ইখলাস হলো সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। এতে অন্য কাউকে শরীক না করা। এমনকি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর প্রেরিত কোনো নবীকেও অংশিদার না করা । এমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ওপর অনুসরণ ও অনুকরণেও ইখলাস থাকা। বিদ‘আত ও সুন্নতের বিপরীত সব ধরণের কাজ বর্জন করা। এছাড়া শাসকগোষ্ঠী শরী‘আত বিরোধী যেসব আইন-কানুন তৈরি করে সেগুলো বর্জন ও বিরোধিতা করা। কেননা কেউ এসব আইনের ওপর সন্তুষ্ট থাকলে বা সেটা অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করার পর তা মেনে নিলে সে মুখলিস ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৭- ভালোবাসা

এর বিপরীত হলো অপছন্দ করা, শত্রুতা পোষণ করা। অতএব, বান্দার ওপর ফরয হলো সে তার সকল কাজ-কর্মে, কথা-বার্তায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে। আল্লাহর অলী ও তাঁর অনুগত বান্দাদেরকেও সে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসবে। এ সব ভালোবাসা যখন সত্যিকার অর্থে হবে, তখন সেটার প্রভাব তার বাহ্যিক দেহে পরিলক্ষিত হবে। তখন দেখা যাবে বান্দা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য করে, যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, আল্লাহর অনুগত্যের মাঝে সে স্বাদ আস্বাদন করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব কথা ও কাজ পছন্দ করে সেগুলো পালনের জন্য দ্রুত ঝাপিয়ে পড়ে, অন্যায় ও গুনাহের কাজের ব্যাপারে সতর্ক থাকে, সে নিজেকে ও পরিবারকে তা থেকে বিরত রাখে, এসব কাজকে ঘৃণা

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩।

করে; যদিও এসব কাজ অন্তরের কাছে প্রিয় ও আনন্দদায়ক। কেননা সে জানে জাহান্নাম প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী বস্তু দিয়ে পরিবেষ্টিত আর জান্নাত কষ্ট ও মনের অপছন্দ জিনিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। যখনই বান্দা এগুলো সত্যিকারভাবে পালন করতে পারবে তখনই তার প্রকৃত ভালোবাসা প্রমাণিত হবে। এ কারণেই যুন্নুন আল-মিসরি রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কখন বুঝব যে, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি? তিনি বললেন, ‘যখন তুমি দেখবে যে, মনের অসন্তুষ্ট ও কষ্টকর আদেশ ধৈর্যের মাধ্যমে পালন করছ’।[1]

কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি দাবী করে যে, সে আল্লাহকে ভালোবাসে অথচ তার কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা সে দাবী অনুযায়ী হয় না তাহলে তার দাবী মিথ্যা। আল্লাহর ভালোবাসার জন্য তিনি তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে শর্ত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [ال عمران: ٣١]

“বলুন, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১

৮- আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর ইবাদত অস্বীকার করা

এ শর্তটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»

[1] আবু নু‘আইম ‘হিলইয়াতুল আউলিয়া’-তে উল্লেখ করেছেন, ৯/৩৬৩।

“যে ব্যক্তি ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই’, এ কথা বলবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করবে, তবে তার জানমাল নিরাপদ হবে। আর তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে”।[1,2]

পঞ্চমত: কালেমা শাহাদাতের বিপরীত কী?

কালেমা শাহাদাহ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এর বিপরীত হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার করা ও তাঁর সাথে শির্ক করা। এ সবের অনেক ধরণ আছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে বা রিযিক দান করে বা জীবন মৃত্যু দান করে বা মহাবিশ্ব পরিচালনা করে বা তাঁর সাথে এসব কাজে শরীক আছে ইত্যাদি দাবী করা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর বিপরীত কাজ।

১- এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢﴾ [سبا: ٢٢]

“বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর। তারা আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে অণু পরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয়। আর এ দু’য়ের মধ্যে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়”। [সূরা সাবা, আয়াত: ২২]

২- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ١﴾ [الانعام: ١]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩।

[2] ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর শর্তাবলী সামান্য পরিমার্জন করে শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবন জিবরীন রহ.-এর ‘শাহাদাতানে, মা‘আনাহুমা ওয়ামা তাসতালযিমুহু কুল্লুম মিনহুমা’ শিরোনাম থেকে নেওয়া হয়েছে।

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তারপর কাফিররা তাদের রবের সমতুল্য স্থির করে”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১]

৩- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ قُلِ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ لَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلَا ضَرّٗاۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ أَمۡ هَلۡ تَسۡتَوِي ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُۗ أَمۡ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلۡقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلۡخَلۡقُ عَلَيۡهِمۡۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ ١٦﴾ [الرعد: ١٦]

“বলুন, ‘আসমানসমূহ ও জমিনের রব কে’? বলুন, ‘আল্লাহ’। আপনি বলুন, ‘তোমরা কি তাঁকে ছাড়া এমন কিছুকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ, যারা তাদের নিজদের কোনো উপকার অথবা অপকারের মালিক নয়? বলুন, ‘অন্ধ ও দৃষ্টিমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে? নাকি তারা আল্লাহর জন্য এমন কতগুলো শরীক নির্ধারণ করেছে, যেগুলো তাঁর সৃষ্টির তুল্য কিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের নিকট সৃষ্টির বিষয়টি একরকম মনে হয়েছে’? বলুন, ‘আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর”। [সূরা আর-রা‘আদ, আয়াত: ১৬]

আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার ব্যাপ্যারটি সমস্ত জাতিই স্বীকার করত; বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার যেসব মুশরিকদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তারাও আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করত। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾ [يونس : ٣١]

“বলুন, ‘আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযিক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের

করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন’? তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। সুতরাং, আপনি বলুন, ‘তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১]

কিন্তু এতদসত্বেও তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দিত না। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونِۭ ٣٦﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦]

“তাদেরকে যখন বলা হত, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই’, তখন নিশ্চয় তারা অহঙ্কার করত। আর বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেব?” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৫-৩৬]

তারা আরো বলত,

﴿أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ٥﴾ [ص: ٥]

“সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য বিষয়!” [সূরা সদ, আয়াত: ৫]

এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান তাদের ঈমানের ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে নি। তাহলে যারা একদম আল্লাহকে রব হিসেবেও মানে না তাদের কি অবস্থা এবার ভেবে দেখুন।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য যে কোনো ধরণের ইবাদত করা। আর ইবাদত হচ্ছে এমন একটি সার্বিক নাম, যা এমন সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথাবার্তা ও কাজকর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলো আল্লাহ ভালোবাসেন ও তাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং এগুলো তিনি ব্যতীত কারো জন্য করা জায়েয নেই।। যেমন, জবাই, মানত, সাজদাহ, ভয়, আশা, ভালোবাসা, সাহায্য

চাওয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। যেমন,

১- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ۝٥﴾ [الفاتحة: ٥]

“আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই”। [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৫]

২- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۝٢١﴾ [البقرة: ٢١]

“হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১]

৩- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ۝٣٦﴾ [النساء : ٣٦]

“তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশি, অনাত্মীয়- প্রতিবেশি, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬]

৪- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ۝٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمۡ أَعۡدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمۡ كَٰفِرِينَ ۝٦﴾ [الاحقاف: ٥، ٦]

“তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের আহ্বান সম্পর্কে উদাসীন। আর যখন মানুষকে একত্র করা হবে, তখন এ উপাস্যগুলো তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে”। [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৫-৬]

৫- আল্লাহ তা‘আলা জিন্ন জাতির ভাষায় বলেছেন,

﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٞ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقٗا ۝٦﴾ [الجن: ٦]

“আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ কতিপয় জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল”। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ৬]

৬- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢﴾ [الكوثر: ٢]

“অতএব, তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর”।[1] [সূরা আল-কাউসার, আয়াত: ২]

তৃতীয়ত: আল্লাহ ও সৃষ্টিজগতের মাঝে ভালোবাসা, সম্মান ও বড়ত্ব ইত্যাদিতে সমতা বিধান করা কালেমা শাহাদাতের বিপরীত কাজ। এ সম্পর্কে দলীল হলো:

১- আল্লাহ তা‘আলার বাণী, ,

﴿قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَاۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡۚ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ۝١٥٠﴾ [الانعام: ١٥٠]

[1] অর্থ কুরবানী করো।

“বলুন, ‘তোমাদের সাক্ষীদেরকে নিয়ে আস, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এটি হারাম করেছেন’। অতএব, যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিয়ো না। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের রবের সমকক্ষ নির্ধারণ করে”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫০]

২- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٦٥﴾ [البقرة: ١٦٥]

“আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর। আর যদি যালিমগণ দেখে- যখন তারা ‘আযাব দেখবে যে, নিশ্চয় সকল শক্তি আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ ‘আযাব দানে কঠোর”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৫]

৩- আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামী মুশরিকদের ভাষায় বলেছেন,

﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ٩٧ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٩٨﴾ [الشعراء : ٩٧، ٩٨]

‘আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম’, ‘যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম’। [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৯৭-৯৮]

৪- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كفر أو أَشْرَكَ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খেল, সে অবশ্যই (আল্লাহর সঙ্গে) কুফরি করল বা শির্ক করল”।[1]

চতুর্থত: আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর ও সৃষ্টির মাঝে অসীলা ও মাধ্যম তালাশ করা, এ ধারণা পোষণ করা যে, তারা তাঁকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে ও তাদের জন্য সুপারিশ করবে। এ কথার দলীল,

১- আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ ٣﴾ [الزمر: ٣]

“জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, ‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ‘ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।’ যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয় সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]

২- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ١٨﴾ [يونس : ١٨]

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, ‘এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী’। বল, ‘তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও জমিনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন? তিনি পবিত্র

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৫১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]

পঞ্চমত: আল্লাহর শরী‘আত ব্যতীত অন্য কোনো বিধান দ্বারা সমাজ ও দেশ পরিচালনা করা। এ সম্পর্কে দলীল হচ্ছে:

১- আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠﴾ [النساء : ٦٠]

“তুমি কি তাদেরকে দেখ নি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার ওপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০]

২- আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩ أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ ۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾ [المائدة: ٤٩، ٥١]

“আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই ‘আযাব দিতে চান। আর মানুষের

অনেকেই ফাসিক। তারা কি তবে জাহেলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৯-৫১]

এ সব ঈমান ও কালেমাবিরোধী কাজ কোনো কোনো মানুষের মাঝে একত্রে সব পাওয়া যেতে পারে, আবার কারো মধ্যে আংশিক পাওয়া যেতে পারে।

বস্তুত: কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম কাজ যা সকল নবী রাসূল করেছেন। রাসূলগণের এ দাওয়াত বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। সকলেরই একই দাওয়াত ছিল।

﴿ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ ٥٩﴾ [الاعراف: ٥٨]

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৮]

এ ধরণের একই দাওয়াত কুরআনে বহু জায়গায় উল্লেখ হয়েছে। এ দাওয়াতের জন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তিনি এ দাওয়াত প্রচারে আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছেন। তাঁর জীবনীই এ সবের জীবন্ত সাক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ، وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي»

"আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা কেবল আল্লাহর ইবাদত করে, যার কোনো শরীক নেই। আর তীরের

ছায়ায় আমার রিযিক নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যে আমার বিরুদ্ধাচারণ করে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা।”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

“আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ্ নেই ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।”[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দাওয়াত দিতে অনেকের কাছে দূত ও পত্র প্রেরণ করেছেন। যেমন, মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ইয়ামেনে প্রেরণের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

««إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ،

---

[1] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৫১১৪। আল্লামা শু‘আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি দ‘য়ীফ। তবে এ হাদীসে অনেকগুলো সহীহ শাহেদ আছে, সে ভিত্তিতে হাদীসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০।

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ»

"তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে এ কথার আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক্ক ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে দিনে এবং রাতে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তারা এ কথাটি মেনে নিলে, সাবধান! যাকাত হিসেবে তুমি তাদের থেকে বাছাই করে উত্তমগুলো নিবে না। আর মযলুমের (বদ) দো'আ থেকে সাবধান! কেননা আল্লাহর ও মযলুমের দো'আর মধ্যে কোনো অন্তরায় নেই।"[1]

কালেমা শাহাদাহ 'লা ইলালা ইল্লাল্লাহ' যেমন বান্দার ঈমানের প্রথম শর্ত তেমনি তা তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়েরও দাবী। হাদীসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

"তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু অত্যাসন্ন তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কালেমা তালকীন (স্মরণ) করতে থাক"।[2]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১৬।

“যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ব্যতীত হক্ক কোনো মা‘বুদ নেই), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।[1]

এ কালেমার জন্যই আল্লাহ জিহাদ, দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা ফরয করেছেন। এ কালেমার কারণেই মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল আহলে ঈমান; তারা জান্নাতী। আর অন্যদল আহলে কুফর; তারা হতভাগা জাহান্নামী।

যারা এ কালেমাকে জীবনে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, এ কালেমার দাবী প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা, সঠিক হিদায়াত ও সফলতা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ۝٨٢﴾ [الانعام: ٨٢]

“যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে সংমিশ্রণ করে নি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ব্যতীত হক্ক কোনো ইলাহ নেই) বলে”।[2]

এ কালেমা দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাতের একমাত্র উৎস, অদ্বিতীয় উপায়। এটি সর্বোত্তম যিকির ও সর্বশ্রেষ্ঠ অসীলা। আমরা আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে ও আমাদের অন্যান্য মুসলিম ভাইদেরকে তাদের

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১১৬। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩।

অন্তর্ভুক্ত করুন যারা এ কালেমার হাকীকত বুঝতে পেরেছেন, সে অনুযায়ী আমল করেছেন এবং কথা কাজে তারা একনিষ্ঠ ছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও দো'আ কবুলকারী।

কালেমা শাহাদার পরিপূরক

‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর সাক্ষ্য কালেমা শাহাদাহ্ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর মধ্যে বাস্তব ও অর্থগতভাবেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, কালেমা শাহাদাহ্ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর ব্যাপারে ইতোপূর্বে যেসব আলোচনা হয়েছে তা সবকিছুই ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে শামিল করবে; যদিও পুরা বাক্যের প্রথমাংশ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উল্লেখ করা হয়। শাহাদাহ ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শাহাদাহর সাথে একত্রিতকরণের অনেকগুলো হিকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১- আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসার প্রমাণ:

এটা ঈমানের মূল অংশ। সুতরাং কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালো না বাসলে মুমিন হতে পারবে না। তাঁর ভালোবাসা ব্যতীত ঈমানদার হতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»

“সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হই”।[1]

২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও আনুগত্য করা:

তাঁর ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলের অনুসরণ সম্পর্কে বলেছেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪।

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢﴾ [ال عمران: ٣١، ٣٢]

“বলো, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১-৩২] সুতরাং কেউ যদি ভাবে যে, সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহকে পাবে তাহলে সে কুফুরী করল। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء : ٦٤]

“আর আমরা যে কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়।”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৪]

৩- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদের উপর বিশ্বাস করা:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন সব কিছুর ওপর ঈমান আনা ও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। কেউ যদি তাঁর আনিত কোনো বিধানের বিরোধিতা করে বা তাতে মিথ্যারোপ করে তাহলে সে কাফের বলে বিবেচিত হবে। চাই তার সে বিরোধিতা প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে বা কোনো রহিত বা প্রথাগতভাবে প্রাপ্ত বিধি-বিধানের অনুসরণের কারণে অথবা জাগতিক কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসরণ করার কারণেই হোক। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ٣٣﴾ [الزمر: ٣٣-٣٤]

“আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হলো মুত্তাকী।”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৩-৩৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ﴾ [التغابن : ٨]

“অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং আমরা যে নূর অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন।”। [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾ [النجم : ٣، ٤]

“আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল অহী, যা তার প্রতি অহীরূপে প্রেরণ করা হয়”। [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

“সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ইয়াহূদী হোক আর খ্রিস্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার সম্পর্কে শুনেছে, অথচ আমার রিসালতের ওপর ঈমান না এনে মারা গেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে”।[1]

এ ঘোষণা আহলে কিতাবদের জন্য। আর অন্যদের ক্ষেত্রে তো আরো বেশি প্রযোজ্য। সুতরাং যারাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনে নি তারা জাহান্নামী হবে।

৪- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার মেনে নেওয়া:

সকল কথা-বার্তা, কাজে-কর্মে তাঁকে ফয়সালাকারী ও বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁর রায়ের ওপর কারো রায়কে অগ্রাধিকার না দেওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء : ٦٥]

“অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ١﴾ [الحجرات: ١]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না”। [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾ [الاحزاب : ٣٦]

“আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না।”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬]

অতএব, যারাই মানব রচিত আইন ও জাহেলী মতামতানুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করে তারা কালেমা শাহাদাহ ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিপরীত কাজে লিপ্ত। সুতরাং তারা ঈমানদার হতে পারবে না।

৫- আল্লাহ তাঁর দ্বারা যা শরী‘আতসিদ্ধ করেছেন তা ছাড়া অন্য কোনো ইবাদত না করা:

আর এর অর্থ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা, তাঁর পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কাজ করা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় দীনের মধ্যে যেসব বিদ‘আত ও নতুন আবিষ্কার করা হয় তা

সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসারী হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١﴾ [الاحزاب : ٢١]

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে"। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾ [النساء : ١١٥]

"আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফিরিয়ে দেবো যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»

"কেউ আমাদের এ শরী'আতে নেই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে"।[1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করলো যা আমাদের দীনে নেই, তবে তা হবে প্রত্যাখ্যাত"।[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

«لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ بَعْدِي عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ»

"আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ-শুভ্র অবস্থায় ছেড়ে গেলাম, যার রাত-দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান। ধ্বংসশীল ব্যতীত কেউ তা থেকে বক্র (পথভ্রষ্ট) হবে না"।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর সুন্নতের অনুসারী সকলের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। আমীন।

[1] ইবন আবু 'আসেম, 'কিতাবুস সুন্নাহ' এ বর্ণনা করেছেন। মুনযিরী রহ. হাদীসের সনদটিকে হাসান বলেছেন।

দ্বিতীয় রুকন: সালাত

ত্বহারাত

ত্বহারাতের পরিচয় ও হুকুম:

ত্বহারাত অর্থ ময়লা-আবর্জনা ও অপবিত্রতা থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন। অর্থাৎ অপবিত্রতা ও নাজাসাত দূর করা। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পবিত্রতা অর্জন ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤﴾ [المدثر: ٤]

"আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর"। [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪]

﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ ٦﴾ [المائدة: ٦]

"আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ».

"ত্বহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবুল হয় না। আর খিয়ানতের সম্পদ থেকে সদকা কবুল হয় না।"[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»

"পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধাংশ।"।[2]

ত্বহারাতের প্রকারভেদ:

ত্বহারাত দু'প্রকার। অপ্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা এবং প্রকাশ্য ও বাহ্যিক পবিত্রতা।

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩।

১- অপ্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা: সব ধরণের শির্ক, সন্দেহ, সংশয়, কুসংস্কার থেকে অন্তরকে পবিত্রকরণ। একমাত্র মহান আল্লাহর ইখলাস, আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠতার সাথে ধাবিত হওয়া, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে এসব অর্জিত হয়। সমস্ত গুনাহ, পাপাচার ও শরী'আত বিরোধী কাজ থেকে অন্তরকে পবিত্র করা। আর এটি খাঁটি তাওবার মাধ্যমের অর্জিত হয়।

২- প্রকাশ্য ও বাহ্যিক পবিত্রতা: শরীরকে ছোট বড় নাপাকী ও নাজাসাত থেকে পবিত্র করা।

ক- ত্বহারাতুল খুবস তথা বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রকরণ বলতে শরীরে বাহ্যিক নাপাকী লেগে থাকলে, সঙ্গমজনিত নাপাকী, হায়েয, নিফাসের নাপাকী ও নাজাসাত ইত্যাদি থেকে পবিত্র পানি দ্বারা শরীর, কাপড়, জমিন ইত্যাদিকে পবিত্রকরণ।

খ- ত্বহারাতুল হাদাস তথা পেশাব, পায়খানা ও অন্যান্য অযু ভঙ্গকারী কারণে অপবিত্র হলে অযু, গোসল ও তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

কীভাবে পবিত্রতা অর্জিত হবে?

পবিত্রতা দু পদ্ধতিতে অর্জন করা যায়:

১- মুতলাক বা স্বাভাবিক পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন। স্বাভাবিক পানি বলতে এমন পানি যা তার সৃষ্টিগত চরিত্র ধারণ করে আছে। কোনো কিছু তার সাথে মিলিত হয়ে তার স্বাদ, গন্ধ বা রঙ পরিবর্তন করে নি। হোক তা আকাশ থেকে বর্ষিত যেমন, বৃষ্টি কিংবা বরফ বা শিলা। অথবা জমিনে প্রবাহমান পানি যেমন সাগরের পানি, নদীর পানি, বৃষ্টির পানি, কূপের পানি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا ٤٨﴾ [الفرقان: ٤٨]

“এবং আমরা আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি”। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৪৮]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

“পানি স্বাভাবিকভাবে পবিত্র, কোনো কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না”।[1]

২- পবিত্র মাটি, বালু, পাথর, শিলা ইত্যাদি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا»

“আমার জন্য জমিনকে পবিত্র ও মসজিদ (সালাতের স্থান) করা হয়েছে”।[2]

পানি পাওয়া না গেলে বা অসুস্থতা ও অন্য কোনো কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [النساء : ٤٣]

“আর যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর।”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৩]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ»

“পবিত্র মাটি মুসলিমদের জন্য পবিত্রতাকারী বস্তু, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। যখন সে পানি পাবে তখন নিজের শরীরে যেন পানি পৌঁছায় (গোসল করে)”।[3]

ফায়েদা: পানির প্রকারভেদ:

১- স্বাভাবিক পানি: ইতোপূর্বে স্বাভাবিক পানির সংজ্ঞা ও হুকুম আলোচনা করা হয়েছে। এ পানি নিজে পবিত্র ও অন্য কিছুকেও পবিত্র করতে পারে।

---

[1] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১১২৫৭ শু‘আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসটি বিভিন্ন শাহেদের ভিত্তিতে সহীহ।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৩।

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ১২৪। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

২- ব্যবহৃত পানি: তা হলো অযু বা গোসলকারীর অঙ্গ স্পর্শ করে পতিত হওয়া পানি। এ পানির হুকুম হলো, পবিত্রতা অর্জনের জন্য স্বাভাবিক পানির মতো এ পানি ব্যবহার করা যাবে। কেননা এ পানি মূলত পবিত্র। হাদীসে এসেছে,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের অতিরিক্ত পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করেন”।[1]

৩-যে পানির সাথে পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়েছে: যেমন, সাবান, গাছের পাতা ইত্যাদি যা আলাদা করা যায়। এ পানির হুকুম হলো, যতক্ষণ এটাকে স্বাভাবিক পানি বলা যায় ততক্ষণ তা পবিত্র। অর্থাৎ এগুলো যদি পানিকে এমন পরিবর্তন করে না দেয় যার কারণে পানিকে পানি বলে অভিহিত করা যায় না, তাহলে তা পবিত্র।

৪- এমন পানি যার সাথে নাপাকি মিশ্রিত হয়েছে: এ পানির দু অবস্থা:

প্রথমত: নাজাসাত যদি পানির স্বাদ, রং ও গন্ধ পরিবর্তন করে দেয় তবে সকল আলেমের মতে, এ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয হবে না।

দ্বিতীয়ত: পানি তার স্বাভাবিক অবস্থাতে বিদ্যমান আছে, এর তিন গুণের কোনো গুণ পরিবর্তন করে দেয় নি। তাহলে এ পানি পবিত্র ও এ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। চাই পানির পরিমান বেশি হোক বা কম হোক। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

“পানি স্বাভাবিকভাবে পবিত্র, কোনো কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না”।[2]

নাজাসাতের প্রকারভেদ:

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[2] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১১২৫৭। শু‘আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসটি বিভিন্ন শাহেদের ভিত্তিতে সহীহ।

نجاسة (নাজাসা) এর বহুবচন نجاسات (নাজাসাত)। মানুষের লজ্জাস্থান (পেশাব বা পায়খানার রাস্তা) থেকে যেসব অপবিত্র জিনিস বের হয়, যেমন পেশাব, পায়খানা, মযী (কামরস), অদী (পেশাবের আগে পরে নির্গত রস), এমনিভাবে যেসব প্রাণির গোস্ত খাওয়া জায়েয নেই সেসব প্রাণির পেশাব, পায়খানা ইত্যাদিকে নাজাসাত বলে। এছাড়াও রক্ত, পুঁজ, বমি ইত্যাদিও নাজাসাত। সমস্ত মৃত প্রাণি ও মৃত প্রাণির অংশবিশেষ সবই নাজাসাত। তবে যেসব চামড়া দাবাগাত বা প্রসেসিং করা হয় সেসব চামড়া পবিত্র। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

“যে কোনো চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলেই তা পাক হয়ে যায়”।[1]

পেশাব পায়খানার আদবসমূহ:

১- মানুষের দৃষ্টির বাহিরে নির্জন স্থানে পেশাব পায়খানা করা। হাদীসে এসেছে,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ، حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি এত দূরে গমন করতেন যে, তাকে কেউ দেখতে পেত না”।[2]

২- হারিয়ে যাওয়ার ভয় না থাকলে এমন কোনো কিছু সাথে না নেওয়া যাতে আল্লাহর নাম রয়েছে।

৩- পেশাব-পায়খানার সময় কথা না বলা।

৪- কিবলাকে সম্মান করা। তাই পেশাব পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ ফিরিয়ে না বসা। কিবলা ছাড়া অন্য দু’দিকে ফিরে বসা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৬৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৬০৯। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ২, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

«لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»

“যখন তোমরা পায়খানায় আসবে তখন তোমরা কিবলামুখী হয়ে ও কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে পেশাব-পায়খানা করবে না; বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে”।[1]

৫- মানুষের কথাবার্তা, বসা ও বিশ্রামের জায়গায়, পানির ঘাট, ফলদার ছায়াদার গাছের নিচে পেশাব পায়খানা থেকে বিরত থাকা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ»

“তোমরা এমন দু’টি কাজ থেকে বিরত থাকো যা অভিশপ্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সেই অভিশপ্ত কাজ দু’টি কী? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের পথে কিংবা ছায়াযুক্ত স্থানে (বৃক্ষের ছায়ায় যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়) পেশাব-পায়খানা করে”।[2]

৬- পেশাব পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা আর বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হওয়া; কিন্তু মসজিদে প্রবেশের সময় এর উল্টোটা করা। অর্থাৎ ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা আর বাম পা দিয়ে বের হওয়া। দু’টি স্থানের মর্যাদার পার্থক্য বুঝানোর জন্য এ ধরণের কাজ করা হয়।

৭- প্রবেশের পূর্বে بسم الله ‘বিসমিল্লাহ’ বলা, আর বের হওয়ার সময় বলবে,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪। লেখকের হাদীসের শব্দাবলী সহীহ বুখারী বা মুসলিমে হুবহু পাওয়া না যাওয়ায় সহীহ বুখারীর নস লেখা হয়েছে। -অনুবাদক।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯; আবু দাউদ হাদীস নং ২৫, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

«اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذبك مِنَ الْخُبْثِ[1] وَالْخَبَائِث»

“হে আল্লাহ! আমি মন্দকাজ ও শয়তান থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি”।[2]

এমনিভাবে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلَاءَ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ»

“জিন্নের দৃষ্টি ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হলো, যখন তাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করে সে যেন ‘বিসমিল্লাহ বলে”।[3]

এছাড়া বিসমিল্লাহ ও উপরোক্ত দো‘আ একত্রে একই হাদীসে এসেছে।[4]

৮- কাপড় এমনভাবে উঠানো যেন জমিন থেকে তার ঢেকে রাখা সতর দেখা না যায়।

৯- পেশাব পায়খানা শেষে ‘গুফরানাকা’ «غُفْرَانَكَ» বলা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত,

অর্থাৎ“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)”।[5]

শৌচকর্ম ও ঢিলা-কুলুখ[6] ব্যবহারের নিয়মাবলী:

---

[1] হাদীসে বর্ণিত শব্দ খুবস ও খাবায়িস দ্বারা মানুষ ও শয়তানের মন্দকাজকে বুঝানো হয়েছে।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৫।

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ৬০৬, ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯৭।

[4] সা‘ঈদ ইবন মানসূর তার সুনানে বর্ণনা করেছেন।

[5] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[6] ইস্তিঞ্জা হলো পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা থেকে পানি, পাথর বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা অপবিত্রতা দূর করা। ইস্তিঞ্জাকে আবার ইস্তিঞ্জা বিলহাজার বা ইস্তিজমার বা ইস্তিবরাও বলা হয়ে থাকে।

১- হাড্ডি বা গোবর দ্বারা শৌচকর্ম ও ঢিলা-কুলুখ না করা। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ».

"তোমরা শুকনো গোবর ও হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে না। কেননা এগুলো তোমাদের ভাই জিন্নদের খাদ্য"।[1]

২- মানুষের উপকারী ও সম্মানিত জিনিস যেমন খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদি দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করা।

৩- ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য বা ইস্তিঞ্জা না করা, বা ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يَمَسَّ أحدكم ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وهو يبول، وَلاَ يَتَمَسَّحْ الخلاء بِيَمِينِهِ»

"তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে"।[2]

৪- ঢিলা কুলুখ বেজোড় সংখ্যা দিয়ে করা, যেমন তিনটি পাথর। তিনটিতে ভালভাবে পরিস্কার না হলে পাঁচটি দিয়ে করা। এমনিভাবে আরো প্রয়োজন হলে বেজোড় সংখ্যায় বৃদ্ধি করা। সালমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ»

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ১৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭। সহীহ বুখারী বা মুসলিমের বর্ণনার শব্দাবলী লেখকের দেওয়া শব্দের মতো নয়; সহীহ বুখারীর বর্ণনা এভাবে,

«وَإِذَا أَتَى الخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه»

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা এভাবে,

«لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন: পায়খানা বা পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে, তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে এবং গোবর বা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে”।[1]

৫- শৌচকাজ ও ঢিলা কুলুখে পানি ও মাটি বা পাথরের টুকরো একত্রে ব্যবহার করতে চাইলে আগে মাটি বা পাথর দিয়ে পরিষ্কার করবে এবং পরে পানি ব্যবহার করবে। আর যদি দু’টির যে কোনো একটি ব্যবহার করে তাহলেও যথেষ্ট হবে। তবে পানি দিয়ে শৌচকাজ করা উত্তম ও এতে অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়।

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২।

অযু

অযু ফরয হওয়ার দলীল:

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা অযু ফরয হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে:

প্রথম দলীল: কুরআনুল কারীম: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: ٦]

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)।"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

দ্বিতীয় দলীল: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

"যে ব্যক্তির হাদস (অপবিত্র) হয় তাঁর সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে অযু করে।"।[1]

তৃতীয় দলীল: ইজমা: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত সব মুসলিম অযু শরী'আতের বিধানবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাই এ বিধানটি দীনের মধ্যে সকলের কাছে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাত বিষয় বলে বিবেচিত।

অযুর ফযীলত:

অযুর ফযীলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৫।

«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ[1]»

“আমি কি তোমাদেরকে এমন (কাজের) কথা বলব না, যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা পাপরাশি দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন? সাহাবায়ে কেরাম ‘আরয করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন, তা হলো, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে অযু করা, মসজিদে আসার জন্য বেশি পদচারণা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখো, এটিই হলো রিবাত্ব (তথা নিজেকে সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত রাখা)”।[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ»

“কোনো মুসলিম কিংবা বলেছেন, কোনো মুমিন, বান্দা যখন অযু করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সে সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যার দিকে তার দু’চোখের দৃষ্টি পড়েছিল এবং যখন দু’হাত ধোয়, তখন, পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সেসব গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলো তার দু’হাতে ধরেছিল এবং যখন দু’পা ধোয় তখন পানির সাথে, অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সেসব

---

[1] الرِّبَاطُ হলো আল্লাহর রাস্তায় লাগাতার জিহাদ। অর্থাৎ পবিত্রতা ও ইবাদতে সর্বদা মশগুল থাকা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমান।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫১।

গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে তার দু’পা অগ্রসর হয়েছিল। ফলে (অযুর শেষে) লোকটি “তার সমুদয় গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠে”।[1]

অযুর ফরযসমূহ:

১-নিয়ত করা। আল্লাহর আদেশ মান্য করতে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে অযু করার জন্য অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করাকে নিয়ত বলে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

“প্রত্যেক কাজ তো কেবল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল”।[2]

২- কপালের উপরিভাগ থেকে থুঁতনি পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে আরেক কানের লতি পর্যন্ত একবার ধৌত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ٦﴾ [المائدة: ٦]

“তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

৩- কনুইসহ দু’হাত ধৌত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]

“কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

৪ -কপালের উপরিভাগের চুল গজানোর স্থান থেকে ঘাড় পর্যন্ত হাত বুলিয়ে মাথা মাসাহ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ ٦﴾ [المائدة: ٦]

“মাথা মাসাহ করো”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

৫ -টাখনুসহ পা ধৌত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ٦﴾ [المائدة: ٦]

“এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করো”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৪।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

৬ -ধৌত অঙ্গের মধ্যে পরস্পর ক্রমবিন্যাস বজায় রাখা। অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা, অতঃপর দু'হাত ধৌত করা, অতঃপর মাথা মাসাহ করা, অতঃপর দু'পা ধৌত করা। কুরআনে অযুর বর্ণনা এভাবেই ধারাবাহিকভাবে এসেছে। তাই পরস্পর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

৭- অযু করার সময় এক অঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথেই অন্য অঙ্গ ধৌত করা এবং ধারাবাহিকভাবে এক অঙ্গ ধৌত করার পর অন্য অঙ্গ ধৌত করতে বিলম্ব না করা। কেননা ইবাদত শুরু করার পরে শেষ না করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمد : ٣٣]

"আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না"। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৩]

তবে সামান্য বিলম্ব করতে দোষ নেই।

অযুর সুন্নতসমূহ:

১- অযু করার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

"যে ব্যক্তি অযুর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে নি (বিসমিল্লাহ বলে নি) তার অযু হয় নি"।[1]

২- অযুর সময় মিসওয়াক করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ».

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৭, আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ১০২, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ মাকতু' বলেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ২৫, ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ পরিচ্ছেদে আবু হুরাইরা, 'আয়েশা, আবু সা'ঈদ, সাহল ইবন সা'দ ও আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

“যদি আমার উম্মাতের জন্য কঠিন না হতো, তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক অযুর সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম”।[1]

৩- অযুর শুরুতে তালু পর্যন্ত দু’হাত ধৌত করা। কেননা উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে অযুর বর্ণনা এভাবে এসেছে, উসমান ইবন ‘আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর আযাদকৃত গোলাম হুমরান রহ. থেকে বর্ণিত,

«أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا »

“তিনি ‘উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে অযুর পানি আনাতে দেখলেন। তারপর তিনি সে পাত্র থেকে উভয় হাতের ওপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ অযুর ন্যায় অযু করতে দেখেছি”।[2]

৪- কুলি করা। মুখের ভিতর পানি নিয়ে নড়াচড়া করে ফেলে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ»

---

[1] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ২১৪; তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে ‘প্রত্যেক অযুর সাথে’ এর পরিবর্তে ‘প্রত্যেক সালাতের সাথে’ বলা হয়েছে।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ»

“আমার উম্মাতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তা হলে প্রত্যেক সালাতের সাথে তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম”। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৮৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫২।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৬।

“যখন তুমি অযু কর তখন কুলি করবে”।[1]

৫- নাকে পানি দেওয়া: নিশ্বাসের সাথে নাকের মধ্যে পানি টেনে নেওয়া ও নাক ঝাড়া, নাকের ভিতর থেকে পানি বের করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

“তুমি পরিপূর্ণরূপে অযু করো এবং নাকের ভেতর উত্তমরূপে পানি পৌঁছাও। কিন্তু তুমি সাওম পালনকারী হলে তা (বাড়তি) করবে না”।[2]

৬- দাঁড়ি খিলাল করা। আম্মার ইবন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে একলোক দাঁড়ি খিলাল করতে দেখে আশ্চর্য হলে তিনি বলেন,

«وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ»

“এ কাজে কে আমাকে বাঁধা দিবে? আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দাঁড়ি খিলাল করতে দেখেছি”।[3]

৭- হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ»

“যখন তুমি অযু করবে তখন দু’হাত ও দু’পায়ের আঙ্গুল খিলাল করবে”।[4]

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৪। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪২; তিরমিযী, হাদীস নং ৭৮৮। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ২৯। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[4] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৯। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৪৭।

৮- দু'কানের উপরিভাগ ও নিচেরভাগ মাসাহ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।

৯- প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা। তবে একবার ধৌত করা ফরয, আর তিনবার ধৌত করা সুন্নত।

১০- হাত পা ধৌত করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ»

"তোমরা যখন পোশাক পরিধান করবে ও অযু করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে"।[1]

১১- চেহারা ও হাতের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ অযু করার সময় মাথার সম্মুখভাগ ও চেহারার আশেপাশের অংশ ধৌত করতে ফরয অংশের চেয়ে একটু বেশি ধৌত করা। আর হাত ধোয়ার সময় কনুইর একটু বেশি ও পা ধোয়ার সময় টাখনুর উপরিভাগসহ ধৌত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ» قال أبو هريرة: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»

"কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, অযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল"। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে"।[2]

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৪১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৬।
হাদীসে বর্ণিত الغرة শব্দের মূল অর্থ ঘোড়ার কপালের সাদা অংশ, আর التحجيل ঘোড়ার পায়ের সাদা অংশ। এখানে غُرًّا مُحَجَّلِينَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা ও হাত পা আলোয় আলোকিত হবে। এটি এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১২- অযুর পরে নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করা।

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁরই রাসুল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো”।[1]

কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

“তোমাদের যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে অযু করে এ দো‘আ পাঠ করবে, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক্ক ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল’ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবে”।[2]

অযুর মাকরূহসমূহ:

১- অযুর এক বা একাধিক সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া। কেননা এতে অযু অপূর্ণ থেকে যায় ও সাওয়াবও কমে যায়।

২- অপবিত্র স্থানে বসে অযু করা। কেননা এতে অপবিত্র জিনিস বেয়ে তার শরীরে লেগে যেতে পারে।

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৫৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪।

৩- পানির অপব্যবহার করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ পরিমাণ পানি নিয়ে অযু করেছেন।[1] আর সব কিছুতেই অপচয় করা নিষিদ্ধ কাজ।

৪- অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনবারের অধিক ধৌত করা। কেননা হাদীসে এসেছে,

«تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অযুর অঙ্গসমূহ) তিন-তিনবার ধৌত করলেন। আর বললেন, অযু এরূপেই করতে হয়। যে ব্যক্তি এর ওপর বাড়ালো, সে অন্যায়, সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করল”।[2]

৫- অযু করার সময় চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গে পানি জোরে নিক্ষেপ করা। কেননা এটি অযুর আদবের পরিপন্থী। এছাড়া এটি প্রিয় বস্তু হারালে মানুষ যেমন চেহারায় থাপ্পর চড় দেয় সেরূপ বুঝায়।

অযুর পদ্ধতি:

কেউ অযু করতে চাইলে প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে শুরু করবে। অযুর নিয়তে দু’হাতের তালুতে পানি নিয়ে তিনবার হাত ধৌত করবে। অতঃপর একই হাতের তালুতে পানি নিয়ে তিনবার করে কুলি ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করবে। এভাবে একই তালুতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি ও নাকে পানি দেওয়া উত্তম। তবে আলাদাভাবে তিনবার করে কুলি ও নাকে পানি দেওয়াও যাবে। অতঃপর মাথার চুল গজানোর জায়গা থেকে দাড়ি পর্যন্ত ও এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। এরপরে ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধৌত করা এবং আঙ্গুল খিলাল করা। এভাবে বাম হাতও কনুইসহ ধৌত করা। অতঃপর নতুন পানি নিয়ে হাত মাথার

---

[1] সহীহ মুসলিম।

[2] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৪০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৬৬৮৪, শু‘আইব আরনাউত এ হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন, তবে হাদীসটি অন্য বর্ণনায় সহীহ।

উপরিভাগ থেকে পিছনের ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে পুনরায় মাথার সম্মুখভাগে নিয়ে এনে মাসাহ করা। অতঃপর হাতের অবশিষ্ট ভেজা অংশ দিয়ে কানের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসাহ করা। আর যদি হাতের আঙ্গুলের পানি শুকিয়ে যায় তবে নতুন পানি দিয়ে আঙ্গুল ভিজিয়ে নেওয়া যায়। অতঃপর ডান পা টাখনুসহ তিনবার অতঃপর বাম পা টাখনুসহ ধৌত করা। অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করা:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁরই রাসুল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো"।[1]

অযু ভঙ্গের কারণসমূহ:

১- মলদার ও লজ্জাস্থান থেকে কোনো কিছু বের হওয়া কম হোক অথবা বেশি হোক। যেমন পেশাব, পায়খানা, মযী, ওয়াদী[2] বের হওয়া, অনুরূপভাবে নিঃশব্দে কিংবা সশব্দে বায়ু নির্গত হওয়া। এর মধ্যে শেষোক্ত দু'টিকে শরী'আতের পরিভাষায় 'হাদাস' বলে। আর এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীর উদ্দেশ্য। তিনি বলেন,

«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৫৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] الودي হলো পেশাব বা পরিশ্রমের পরে ঘন সাদা পানি পুং লিঙ্গ থেকে বের হওয়া। এতে গোসল ফরয হবে না। শুধু المني তথা বীর্য বের হলে গোসল ফরয হবে।

"তোমাদের মধ্যে যার হাদাস (অপবিত্র) হয় আল্লাহ তা'আলা তার সালাত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে অযু করে"। ।[1]

২- এমন গভীর ঘুম, যাতে অনুভূতি থাকে না এবং বসার স্থান মাটির সাথে লেগে থাকে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْعَيْنُ وِكَاءُ[2] السَّهِ، فَمَنْ نَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ»

"চোখ হলো পশ্চাদদ্বারের বন্ধনস্বরূপ। অতএব, যে ব্যক্তি ঘুমায় সে (যদি সালাত আদায় করতে চায়) যেন অযু করে"।[3]

৩- কোনো আবরণ ব্যতীত হাতের তালু ও আঙ্গুল দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

"যে ব্যক্তি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে তাকে অযু করতে হবে"।[4]

৪- অজ্ঞান হওয়া। পাগল, মাতাল, বেহুশ, রোগ বা নেশার কারণে জ্ঞানশূন্য হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই অল্পসময় অজ্ঞান থাকুক বা বেশি সময়, মাটিকে বসে থাকা সম্ভব হোক বা না হোক। কেননা এ ধরণের জ্ঞানশূন্যতা ঘুমের কারণে বে-খেয়ালের চেয়েও বেশি অবচেতন থাকে, ফলে ব্যক্তি বুঝতে পারে না এ সময় অযু ভঙ্গকারী কোনো কারণ যেমন বায়ু নির্গত হওয়া বা অন্য কোনো কারণ তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে কি-না। অজ্ঞান হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়, এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত।

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৫।

2 وِكَاءُ হলো বন্ধন, আর السَّهِ হলো পশ্চাদদ্বার।

[3] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৭৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[4] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৮২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ৮২, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছনে। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫- কামভাবের সাথে নারী স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে যাবে। লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে যেমন কামভাবের সৃষ্টি হয় ফলে অযু ভেঙ্গে যায়, তেমনি নারী স্পর্শ করলেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাই এতে অযু ভেঙ্গে যায়। আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ মতের প্রবক্তা। তিনি বলেন,

«قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلاَمَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ».

"পুরুষ কর্তৃক তার স্ত্রীকে চুম্বন করা ও উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা হলো কুরআনে বর্ণিত 'মুলামাসা'। সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুম্বন করবে বা হাত দ্বারা স্পর্শ করবে তার ওপর অযু অবশ্যম্ভাবী হবে"।[1]

৬- মুরতাদ হলে অযু ভেঙ্গে যায়। (আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন)। মুখে উচ্চারণ করুক বা অন্তরে বিশ্বাস করুক বা সন্দেহ পোষণ করুক যেভাবেই ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হোক তাতে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ এভাবে করলে তার অযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং যাবতীয় ইবাদত বাতিল হয়ে যাবে। এরপর ইসলামে ফিরে আসলে যতক্ষণ সে অযু না করবে ততক্ষণ সালাত আদায় করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ﴾ [المائدة: ٥]

---

[1] মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং ১৩৪, হাদীসের সনদটি সহীহ।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء : ٤٣]

"আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৩]

এখানে মুলামাসা বা স্পর্শ বলতে সহবাস ছাড়া কামভাবের সাথে কোনো আবরণ ব্যতীত নারীকে স্পর্শ করা। আর তাতে অযু ভেঙ্গে যায়।

“আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٤]

“তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৪]

৭ -উটের গোশত ভক্ষণ করলে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন,

أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ»

“আমি কি বকরীর গোশত খেয়ে অযু করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা, অযু করতেও পার আর নাও করতে পার। সে বলল, আমি কি উটের গোশত খেয়ে অযু করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে তুমি অযু করবে।[1]

ইমাম নাওয়াবী রহ. বলেছেন, এ মতটি দলীলের বিবেচনায় খুবই শক্তিশালী; যদিও জমহুর আলেম এ মতের বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। সাহাবী, তাবে‘ঈ ও তাদের পরবর্তীগণ বিশেষ করে চার খলীফা ও জমহুর আলেমের মতে, উটের গোশত খেলে অযু ভঙ্গ হয় না। তারা উপরোক্ত হাদীসকে মানসূখ বলেছেন।

যে সব কাজের জন্য অযু করা ফরয:

তিন ধরণের কাজের জন্য অযু ফরয:

প্রথমত: সালাত: ফরয, ওয়াজিব, নফল এমনকি জানাযার সালাতসহ সবধরণের সালাতের জন্য অযু করা ফরয। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৬০।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ﴾ [المائدة: ٦]

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

অর্থাৎ তোমরা যখন সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন যদি তোমরা অযুবিহীন থাক তবে তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করো......।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ».

"ত্বহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবুল হয় না। আর খিয়ানতের সম্পদ থেকে সদকা কবুল হয় না"।[1]

২- বাইতুল্লাহর তাওয়াফ: তাওয়াফ করলে অযু করতে হয়। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত মারফু' হাদীসে এসেছে,

«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ»

"বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সালাতের ন্যায়। অতএব, তাওয়াফের সময় কথা কমই বলবে"।[2]

৩- কুরআন স্পর্শ করা: কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»

"পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না"।[3]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪।

[2] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ২৯২২, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৮৩৬, শু'আইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] সুনান দারেমী, হাদীস নং ২৩১২, দারেমীর মুহাক্কিক হুসাইন সেলিম বলেছেন, হাদীসের সনদটি দ'য়ীফ। দারাকুতনী, হাদীস নং ৪৩৯। সুনান আল-কুবরা লিল বাইহাকী, হাদীস নং

চার মাযহাবের আলেমদের ঐকমত্যে, অযু ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে অযু ব্যতীত স্পর্শ ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে। এছাড়াও অযু ব্যতীত গিলাফ বা আবরণসহ কুরআন বহন করা যাবে।

ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির অযু:

ওযরগ্রস্ত ব্যক্তি বলতে বুঝায়, যার অধিকাংশ সময় অযু নষ্ট হয়ে যায়। যেমন: কারো পেশাব পড়তে থাকা, বায়ু বের হওয়া বা মুস্তাহাযা মহিলা যার হায়েযের নির্ধারিত সময় ছাড়াও রক্ত বের হতে থাকে। এ ধরণের লোকেরা প্রতি ওয়াক্ত সালাতের সময় নতুন অযু করে সালাত আদায় করবে (সাথে সাধ্যানুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে)। ওযর থাকা সত্বেও তাদের সালাত সহীহ হবে। এর দলীল হলো, ফাতিমা বিনত আবু হুবায়েশ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ইস্তিহাযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন,

«ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي»

“অতঃপর প্রত্যেক সালাতের পূর্বে অযু করে সালাত আদায় কর”।[1]

অন্যান্য ওযরগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকেও এ হাদীসের আলোকে বিবেচনা করা হবে।

অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি:

১- অসুস্থ ব্যক্তি ছোট অপবিত্র হলে পানি দ্বারা অযু করে পবিত্রতা অর্জন করবে, আর বড় নাপাকী হলে গোসল করে পবিত্র হবে।

২- অক্ষমতা বা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা বা রোগমুক্তিতে বিলম্বের আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করে পবিত্র হবে।

৩- তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো:

৪১০। হাদীসটির একাধিক বর্ণনা সূত্র থাকায় এটি সহীহ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৯৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

পবিত্র মাটিতে একবার উভয় হাত একবার মারবে, এরপর দু'হাত দিয়ে চেহারা ও দু হাতের কব্জি পরস্পর মাসাহ করবে। কেউ তায়াম্মুম করতে অক্ষম হলে অন্যব্যক্তি তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। সে তার উভয় হাত মাটিতে মারবে এবং অসুস্থব্যক্তির চেহারা ও হাতের কব্জি মাসাহ করিয়ে দিবে। কেউ অযু করতে অক্ষম হলে যেমন অন্য ব্যক্তি অযু করিয়ে দেয় তেমনি তায়াম্মুম করতে অক্ষম হলেও অন্য ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে এবং তায়াম্মুম করিয়ে দিবে।

৪- দেওয়াল বা এমন জিনিস যাতে ধুলা আছে সেসব জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েয। দেওয়াল যদি মসৃণ হয়, যেমন এতে পেইন্টিং বা অন্য কোনো মসৃণ কিছু থাকে তবে ধুলা না থাকলে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। অবশ্য যদি তাতে ধুলা থাকে তবে এমন দেওয়াল দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয।

৫- দেওয়াল বা ধুলা মিশ্রিত এমন কিছু পাওয়া না গেলে রুমাল বা পাত্রে মাটি রেখে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে।

৬- একবার তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলে অন্য সালাতের সময় হলে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারাই আবার সালাত আদায় করা যাবে; কেননা অযু ভঙ্গকারী এমন কিছু ঘটেনি যাতে নতুন করে তায়াম্মুম করতে হবে। তবে প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করা মুস্তাহাব।

৭- অসুস্থ ব্যক্তিকে তার শরীরে বিদ্যমান নাজাসাত তথা অপবিত্রতা দূর করতে হবে। তবে এ অপবিত্রতা যদি দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করবে। তার সালাত শুদ্ধ হবে এবং পুনরায় আদায় করতে হবে না।

৮- অসুস্থ ব্যক্তির কাপড় পবিত্র করতে হবে বা খুলে পবিত্র কাপড় পরিধান করতে হবে। যদি কাপড় পরিবর্তন করা সম্ভব না হয় তাহলে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করবে এবং পুনরায় তা আর আদায় করতে হবে না।

৯- অসুস্থ ব্যক্তিকে পবিত্র জায়গায় সালাত আদায় করতে হবে। বিছানা নাপাক হলে ধুয়ে ফেলতে হবে বা পবিত্র বিছানা বিছিয়ে পরিবর্তন করে ফেলতে হবে

বা এর উপরে পবিত্র আরেকটি বিছানা বিছাতে হবে। আর যদি এসব কিছুই করা সম্ভব না হয় তবে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করবে। তার সালাত শুদ্ধ হবে এবং পুনরায় আদায় করতে হবে না।

গোসল

এমন বড় অপবিত্রতা যার কারণে ইবাদত করতে বাঁধা রয়েছে তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দেওয়াকে গোসল বলে।

গোসল শরী'আতসম্মত হওয়ার দলীল:

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা গোসল শরী'আতসম্মত হওয়া প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ﴾ [المائدة: ٦]

"আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ﴾ [النساء : ٤٣]

"এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও (সেটা ভিন্ন কথা)"। [আন-নিসা, আয়াত: ৪৩]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

« إِذَا تجَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ»

"যখন কোনো নারী-পুরুষের একের লজ্জাস্থান অপরের লজ্জাস্থানের সাথে স্পর্শ করবে তখন গোসল ফরয হবে"।[1]

গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ:

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪৯।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মূলত এভাবে, -অনুবাদক-

«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

নিম্নোক্ত কারণে গোসল ফরয হয়:

১- বড় অপবিত্রতা: কামভাবের সাথে ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হবে। তাছাড়া সঙ্গম করলে গোসল ফরয হবে। সঙ্গম হলো পুরুষাঙ্গ পুরোপুরি বা অগ্রভাগ নারীর যোনীর মধ্যে প্রবেশ ঘটানো, এতে বীর্যপাত হোক বা না হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ﴾ [المائدة: ٦]

"আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

«إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

"নারী পুরুষের লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে গোসল ফরয হয়ে যায়"।[1]

২- হায়েয ও নিফাস: হায়েয ও নিফাস শেষ হলে গোসল ফরয হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

"সুতরাং তোমরা হায়েযকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন"। [সূরা বাকারা, আয়াত: ২২২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনত আবু হুবাইশ রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেছেন

«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي وصلي»

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬০৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

“যখন তোমার হায়েয শুরু হয় তখন তুমি সালাত ছেড়ে দাও। আর হায়েয শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় কর”।[1]

৩- মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ফরয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কন্যা যয়নাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা মারা গেলে তাকে গোসল দিতে নির্দেশ দেন।

৪- কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার ওপর গোসল ফরয। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়েস ইবন ‘আসেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করতে নির্দেশ দেন।[2] এমনিভাবে সুমামা আল-হানাফী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকেও ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করতে নির্দেশ দেন।[3]

যাদের ওপর গোসল মুস্তাহাব:

নিম্নোক্ত কারণে গোসল করা মুস্তাহাব:

১- জুম‘আর সালাতের উদ্দেশ্যে গোসল করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৩।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। নাসায়ী ও অন্যান্য হাদীসে এ ঘটনা এসেছে, হাদীসটি সহীহ।

খলীফা ইবন হুসায়েন থেকে তার দাদা কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»

“আমি ইসলাম কবুল করার আগ্রহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলে তিনি আমাকে কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করার নির্দেশ দেন”। আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ১২৩৮। আল্লামা শু‘আইব আরনাউত হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছেন। সুনান আল-কুবরা লিলবাইহাকী, হাদীস নং ৮০৫। এ হাদীসের মূল ঘটনা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে।

«غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

“জুম‘আর দিনে গোসল করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব”।[1]

২- মৃতব্যক্তিকে গোসলদানকারীর ওপর গোসল করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حمله فليتوضأ »

“যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলো, সে যেন গোসল করে। আর যে জানাযা বহন করে সে যেন অযু করে”।[2]

৩- ইহরাম পরিধানের সময় গোসল করা। হজ বা উমরার জন্য ইহরাম পরিধান পরিধান করতে ইচ্ছা করলে তার জন্য সুন্নত হলো গোসল করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে গোসল করেছেন। যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«أنه رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ»

“তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোশাক খুলতে ও গোসল করতে দেখেছেন”।[3]

৪- মক্কায় প্রবেশ করলে এবং ‘আরাফায় অবস্থান করলে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন। মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল সম্পর্কে ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

«كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ»

“ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা ‘যি তুওয়া- তে রাত যাপন না করে মক্কায় প্রবেশ করতেন না। সকাল হলে গোসল করতেন, অতঃপর দিনের বেলায়

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৪৬।

[2] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৪৬৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৩০, ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মক্কায় প্রবেশ করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করতেন”।[1]

এছাড়া ‘আরাফায় অবস্থানের জন্য গোসল সম্পর্কে ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার হাদীস,

«كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ»

“আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা ইহরামের পূর্বে ইহরামের জন্য, মক্কায় প্রবেশের জন্য ও ‘আরাফায় অবস্থানের জন্য গোসল করতেন”।[2]

৫- দু’ ঈদের জন্য গোসল করা: আলেমগণ দু’ঈদের সালাতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব বলেছেন; যদিও এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। বদরুল মুনীর প্রণেতা বলেছেন, দুই ঈদের গোসল সম্পর্কিত হাদীসসমূহ দুর্বল; তবে সাহাবীগণ থেকে জাইয়্যিদ সনদে ‘আছার’ তথা তাঁদের কর্মকাণ্ড বা বক্তব্য পাওয়া যায়।

গোসলের ফরযসমূহ:

১-নিয়ত করা: গোসলের মাধ্যমে বড় অপবিত্রতা দূরীকরণে অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

“প্রত্যেক কাজ নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে”।[3]

২- সমস্ত শরীরে এমনভাবে পানি প্রবাহিত করা যেন শরীরের অঙ্গ ঘষা মাজা করা যায়। আর যেসব অঙ্গ ঘষা-মাজা করা সম্ভব নয় তাতে এমনভাবে পানি প্রবাহিত করে দেওয়া যেন পানি সেসব অঙ্গে পৌঁছেছে বলে প্রবল ধারণা হয়।

৩- চুল খিলাল করা: মাথা ও অন্যান্য স্থানের চুল উত্তমরূপে খিলাল করা।

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৯।

[2] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ১১৫২। উক্ত হাদীসের মূল বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

গোসলের সুন্নতসমূহ:

১- গোসলের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। কেননা প্রত্যেক ভালো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয়।

২- শুরুতে তিনবার করে দু হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

৩- প্রথমেই লজ্জাস্থান ও এর আশেপাশের অপবিত্রতা ধুয়ে ফেলা।

৪- সালাতের অযুর ন্যায় গোসলের শুরুতে পূর্ণ অযু করা। তবে গোসলকারীর জন্য সুযোগ রয়েছে গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত দু পা দেরী করে ধৌত করার। 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীসে এসব সুন্নত উল্লেখ আছে। তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর দু'হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। তারপর সালাতের অযুর মতো অযু করতেন"।[1]

গোসলের মাকরূহসমূহ:

১- পানির অপব্যবহার করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করেছেন।

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পানি দিয়ে অযু করতেন। এক সা' থেকে পাঁচ মুদ্দ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন"।[2]

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৬।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৫।

“এক সা‘ পানিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাবাতের গোসল সম্পন্ন হয়ে যেত এবং এক মুদ্দ পানিতে অযু হয়ে যেত”।[1]

২- অপবিত্র স্থানে গোসল করা। কেননা এতে অপবিত্রতা শরীরে লাগার সম্ভাবনা থাকে।

৩- কোনো পর্দা ছাড়া খোলা স্থানে গোসল করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ»

“আল্লাহ তা‘আলা , লজ্জাশীল, (মানুষের পাপ) আড়ালকারী। তিনি লজ্জাশীলতাকে এবং পর্দা করাকে পছন্দ করেন। অতএব, তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে, সে যেন পর্দা করে”।[2]

৪- স্থির পানি দ্বারা গোসল করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ».

“তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় স্থির পানিতে গোসল না করে”।[3]

গোসলের পদ্ধতি:

গোসলের মাধ্যমে বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবে। অতঃপর দু হাত তার কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। তারপর ইস্তেঞ্জা করবে, তাই তার উভয় লজ্জাস্থান ও তার চারপাশে পানি দিয়ে ধৌত করে অপরিস্কার জিনিস থেকে মুক্ত হবে, অতঃপর পরিপূর্ণরূপে অযু করবে, তবে গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত পা ধৌত করা দেরী করা যাবে। অতঃপর মাথায়

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৬।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০১২; সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৪০৬।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৩।

পানি ঢেলে দিবে এবং চুলের মূল অংশে খিলাল করবে।[1] অতঃপর কানসহ মাথা তিনবার ধৌত করবে, অতঃপর ডান পাশে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গে পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর বা পাশে একইভাবে পানি ঢেলে দিবে। গোসলের সময় আড়াল ও পর্দা ঘেরা স্থান নির্বাচন করার চেষ্টা করবে। ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস থেকে উপরোক্ত নিয়মগুলো পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ: يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثم يفرغ بيمينه على شماله فيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثم يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ المَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رجليه»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাকির জন্য গোসল করতে ইচ্ছা করতেন, তখন উভয় হাত ধোয়ার মাধ্যমে গোসল শুরু করতেন। অতঃপর তিনি লজ্জাস্থান ধুতেন এবং সালাতের অযুর মতো অযু করতেন। অতঃপর চুলের ভেতরে পানি পৌঁছাতেন এবং মাথায় তিন আঁজলা পানি

[1] এটি পুরুষের চুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে নারীর ক্ষেত্রে মাথায় তিন আজলা পানি ঢেলে দিয়ে ঘষে দিবে এবং বেণী খুলতে হবে না। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ».

“একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাথার বেণী তো খুবই মোটা এবং শক্ত। আমি কি জানাবাতের গোসলের জন্য তা খুলে ফেলব? তিনি বললেন, না, তোমার মাথায় কেবল তিন আজলা পানি ঢেলে দিলেই চলবে, এরপর তোমার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিবে। এ ভাবেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩০)।

ঢালতেন। অতঃপর তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন, অতঃপর উভয় পা ধৌত করতেন”।[1]

নাপাকী অবস্থায় যে সব কাজ করা হারাম:

১- ফরয বা নফল যে কোনো ধরণের সালাত পড়া হারাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ﴾ [النساء : ٤٣]

“হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৩]

২- কুরআন স্পর্শ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»

“পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না”।[1]

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ১০৪। ইমাম তিরমিযী রহ.হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসটি মুসলিমে এভাবে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ. ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন তখন প্রথমে উভয় হাত ধুইতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুইতেন। তারপর সালাতের অযুর ন্যায় অযু করতেন। তারপর পানি নিয়ে তাঁর আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় ঢুকাতেন। এমনিভাবে যখন মনে করতেন যে, তা ভিজে গেছে তখন মাথায় তিন আজলা পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। তারপর তাঁর উভয় পা ধুয়ে ফেলতেন”। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৬)।

[1]

৩ -কা‘বা শরীফ যিয়ারত করা।

৪- কুরআন তিলাওয়াত করা। কেননা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا»

“জুনুবী না হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল অবস্থায়ই আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন”।[2]

৫- মসজিদে অবস্থান করা। তবে প্রয়োজনে মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করা যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ ٤٣﴾ [النساء : ٤٣]

“এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও (সেটা ভিন্ন কথা)”। [আন-নিসা, আয়াত: ৪৩]

---

[1] সুনান দারেমী, হাদীস নং ২৩১২। দারেমীর মুহাক্কিক হুসাইন সেলিম বলেছেন, হাদীসের সনদটি দ‘য়ীফ। দারাকুতনী, হাদীস নং ৪৩৯। সুনান আল-কুবরা লিল বাইহাকী, হাদীস নং ৪১০। হাদীসটির একাধিক বর্ণনা সূত্র থাকায় এটি সহীহ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৬। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ‘য়ীফ বলেছেন।

সালাত

সালাতের হুকুম:

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর সালাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক আয়াতে সালাত কায়েম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣ ﴾ [النساء : ١٠٣]

"অতপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয"। [আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

"তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতকে ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে দ্বিতীয় রুকন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য দান, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা"।[1]

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬।

অতএব, সালাত ত্যাগকারী কাফির, তাকে শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী হত্যা করা জায়েয। আর সালাতে অলসতা ও অবহেলাকারী ফাসিক।

সালাতের ফযীলত:

সালাতের ফযীলত ও সাওয়াব অপরিসীম। এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

১- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন আমলটি উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন,

«الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا»

“যথাসময়ে সালাত আদায় করা”।[1]

২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا»

“তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় যদি একটি নদী থাকে। আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? এ ব্যাপারে তোমরা কি বলো? সবাই বললো: না, তার শরীরে কোনো প্রকার ময়লা থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা সব গুনাহ মুছে নিঃশেষ করে দেন”।[2]

৩- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৫।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬৭।

“কোনো মুসলিম ব্যক্তির যখন ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে সালাতের অযুকে উত্তমরূপে আদায় করে, সালাতের বিনয় ও রুকুকে উত্তমরূপে আদায় করে তা হলে যতক্ষণ না সে কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এ এ সালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্ব যুগেই বিদ্যমান”।[1]

৪- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ»

“সব কিছুর মাথা হলো ইসলাম, বুনিয়াদ হলো সালাত আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো জিহাদ”।[2]

সালাত ত্যাগকারী সম্পর্কে সতর্কতা:

কুরআন ও হাদীসে অনেক জায়গায় সালাত ত্যাগকারী ও বিলম্বে আদায়কারীর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم: ٥٩]

“তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রাপ্ত হবে”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯]

﴿ فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ ﴾ [الماعون: ٤، ٥]

“অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজদের সালাতে অমনোযোগী”। [সূরা আল-মা‘ঊন, আয়াত: ৪-৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৮।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»

“বান্দা এবং শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা”।[1]

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»

“আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হলো সালাত। অতএব, যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো, সে কাফের হয়ে গেলো।”[2]

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এতে তিনি বললেন,

«مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا، وَلَا بُرْهَانًا، وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ»

“যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করবে এবং তা সংরক্ষণ করবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য আলো, ঈমানের দলীল ও জাহান্নাম থেকে নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করবে না ও তা সংরক্ষণ করবে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য কোনো আলো, নাজাত ও ঈমানের দলীল হবে না। আর কিয়ামতের দিন সে কারুন, ফির‘আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে উত্থিত হবে”।[3]

সালাতের শর্তসমূহ:

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮২।

[2] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১০৭৯। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২১, ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৬৫৭৬। শু‘আইব আরনাউত বলেন, হাদীসের সনদটি হাসান। সুনান দারেমী, হাদীস নং ২৭৬৩। মুহাক্কিক হুসাইন সেলিম হাদীসের সনদটি সহীহ বলেছেন।

সালাত শুরু করার পূর্বে শুধু নিয়ত ব্যতীত এসব শর্ত পূরণ হতে হবে। কেননা তাকবির বলার সময় নিয়ত করা উত্তম। মুসল্লীর ওপর ফরয হলো এসব শর্ত পূর্ণ করা। এসব শর্তের কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

প্রথম শর্ত: ইসলাম

সুতরাং কাফির ব্যক্তির সালাত সহীহ হবে না এবং আদায় করলেও কবুল হবে না। এমনিভাবে সমস্ত ইবাদতের শর্ত হলো ইসলাম গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿مَا كَانَ لِلۡمُشۡرِكِينَ أَن يَعۡمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ وَفِي ٱلنَّارِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ١٧﴾ [التوبة: ١٧]

"মুশরিকদের অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, নিজদের ওপর কুফরীর সাক্ষ্য দেওয়া অবস্থায়। এদেরই আমলসমূহ বরবাদ হয়েছে এবং আগুনেই তারা স্থায়ী হবে"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১৭]

দ্বিতীয় শর্ত: আকল বা জ্ঞান থাকা

সুতরাং পাগলের ওপর সালাত ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»

"তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়"।[1]

তৃতীয় শর্ত: বালেগ হওয়া

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪০৩। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২০৪১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অতএব, উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী নাবালেগের ওপর সালাত ফরয হবে না, যতক্ষণ সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। তবে সাত বছর থেকে বাচ্চাদেরকে সালাতের প্রতি উৎসাহ ও নির্দেশ দেওয়া মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا»

"তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে সালাত পড়ার নির্দেশ দাও এবং যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন সালাত না পড়লে এজন্য তাদের শাস্তি দাও"।[1]

চতুর্থ শর্ত: ছোট ও বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা

ছোট নাপাকী বলতে বুঝায় যে কারণে অযু ফরয হয়। আর বড় নাপাকী বলতে বুঝায় যে কারণে গোসল ফরয হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ﴾ [المائدة: ٦]

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ».

"ত্বহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবুল হয় না। আর খিয়ানতের সম্পদ থেকে সদকা কবুল হয় না"।[2]

পঞ্চম শর্ত: শরীর, কাপড় ও জায়গা পাক হওয়া:

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৪। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪।

- শরীর পাক হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুস্তাহাযাকে বলেছেন,

«اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»

"হায়েয শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় কর"।[1]

- কাপড় পাক সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤﴾ [المدثر: ٤]

"আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর"। [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪]

- আর জায়গা পাক হওয়া। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক বেদুঈন মসজিদে এসে পেশাব করে দেয়। লোকেরা তাকে ধমক দিতে আরম্ভ করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন:

«دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا[2] مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»

"তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমরা নরম (ভদ্র) ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয়েছ, কঠোর ও রূঢ় আচরণের জন্যে নয়"।[3]

ষষ্ঠ শর্ত: সালাতের ওয়াক্ত হওয়া

সালাতের ওয়াক্ত না হলে সালাত ফরয হয় না। তাই ওয়াক্ত হওয়ার আগে সালাত আদায় করলে সহীহ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء : ١٠٣]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৩।

[2] سَجْل হলো পানি ভর্তি বালতি। আর ذَنُوب হলো পানি ভর্তি বড় বালতি।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১২৮।

“নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

অর্থাৎ সালাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হবে; কেননা জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের ওয়াক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি একদিন প্রথম ওয়াক্তে সালাতের ইমামতি করেছেন এবং আরেকদিন সালাতের শেষ ওয়াক্তে সালাত পড়িয়েছেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন,

«مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ»

“এই দু’ সময়ের মধ্যবর্তী পুরো সময়ই সালাতের ওয়াক্ত”।[1]

সপ্তম শর্ত: সতর ঢাকা

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الاعراف: ٣١]

“হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩১]

কাপড়ের সৌন্দর্য হলো যা দ্বারা সতর ঢাকা হয়। সমস্ত আলেম একমত যে, সালাত শুদ্ধ হতে সতর ঢাকা ফরয। সতর ঢাকতে সক্ষম হওয়া সত্বেও সতর না ঢাকলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

অষ্টম শর্ত: নিয়ত করা

কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

“প্রত্যেক কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে”।[2]

---

[1] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৫২৬। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

নবম শর্ত: কিবলামুখী হওয়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ﴾ [البقرة: ١٤٤]

“আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমরা অবশ্যই দেখছি। অতএব আমরা অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৪]

সালাতের রুকনসমূহ:

সালাতের বেশকিছু রুকন বা ফরয রয়েছে। এগুলোর কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এগুলো নিম্নরূপ:

১- নিয়ত করা। নির্দিষ্ট ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

“প্রত্যেক কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল”।[1]

তাকবীরে তাহরীমার সাথে দু হাত উঠানোর সময়ই নিয়ত করতে হবে। তবে সামান্য আগে পরে হলে কোনো অসুবিধে নেই।

২- ‘আল্লাহু আকবর’ তাকবীর বলে সালাতে প্রবেশ করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

“পবিত্রতা হলো সালাতের চাবি, তার তাকবীর হলো (সালাত ব্যতীত সব কাজ) হারামকারী এবং তার সালাম হলো (সালাতের বাইরের সব কাজ) হালালকারী”।[1]

৩- দাঁড়িয়ে সালাত আদায়: ফরয সালাত সামর্থ্য থাকলে দাঁড়িয়ে আদায় করা। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨][2]

“তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছেন,

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

“দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে, যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে”।[3]

৪- সূরা ফাতিহা পাঠ: ফরয ও নফল সালাতের প্রতি রাকা‘আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»

“যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার সালাত হল না”।[4]

৫- রুকু করা। এটি নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে সালাতের ফরযের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

---

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ৬১; তিরমিযী, হাদীস নং ৩, ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদীসটি এ পরিচ্ছেদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস।

[2] قَٰنِتِينَ হলো বিনয়ী, অবনত। এখানে কিয়াম দ্বারা সালাতে দাঁড়ানো বুঝানো হয়েছে।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১১৭।

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৬।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩ ٧٧ ﴾ [الحج : ٧٧]

“হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ‘ কর, সাজদাহ কর, তোমাদের রবের ইবাদত কর এবং ভালো কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে”। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বলেছেন,

«ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا»

“তারপর রুকুতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে আদায় করবে”।[1]

৬- রুকু হতে উঠা। উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বলেছেন,

«ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا»

“তারপর রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে”।[2]

৭- রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। উপরোক্ত হাদীসে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে বলেছেন,

«لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ»

“আল্লাহ সে ব্যক্তির সালাতের দিকে তাকান না, যে ব্যক্তি তার রুকু থেকে পিঠ সোজা করে দাঁড়ায় না ও সাজদাহ থেকে সোজা হয়ে বসে না”।[3]

৮- সাজদাহ করা। উপরোক্ত (সূরা হজের ৭৭নং) আয়াত সাজদাহ করতে নির্দেশ দিয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বলেছেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৭।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৭।

[3] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১০৭৯৯। মুহাক্কিক শু‘আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি হাসান।

«ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا»

“তারপর সাজদাহয় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ করবে”।[1]

৯- সাজদাহ থেকে উঠে বসা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বলেছেন,

«ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»

“তারপর সাজদাহ থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে”।[2]

১০ -দু’সাজদাহর মাঝে বসা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ»

“আল্লাহ সে ব্যক্তির সালাতের দিকে তাকান না, যে ব্যক্তি রুকু থেকে পিঠ সোজা করে দাঁড়ায় না ও সাজদাহ থেকে সোজা হয়ে বসে না”।[3]

১১- ধীর স্থিরভাবে করা: রুকু, সাজদাহ, রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো, সাজদাহ থেকে উঠে বসা ইত্যাদি ধীর স্থিরভাবে করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বলেছেন,

«حَتَّى تَطْمَئِنَّ »

এ হাদীসে তিনি রুকু, সাজদাহ, রুকু ও সাজদাহ থেকে সোজা হয়ে উঠা উল্লেখ করেছেন। ধীরস্থিরতার পরিমান হলো, রুকু, সাজদাহ, দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় স্থির হয়ে কমপক্ষে একবার ‘সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আযীম’ বলতে সক্ষম হওয়া। একের অধিক বলা সুন্নত।

১২- শেষ বৈঠক ও তাতে তাশাহহুদ পড়া। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৭।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৭।

[3] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১০৭৯৯। মুহাক্কিক শু‘আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি হাসান।

তাশাহহুদ ফরয হওয়ার আগে আমরা ‘বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহকে সালাম, জিবরীল ও মিকাঈল আলাইহিমাস সালামের ওপর সালাম বলতাম’। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«لَا تَقُولُوا هَكَذَا، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

“আল্লাহর প্রতি সালাম, তোমরা এরূপ বল না। কারণ আল্লাহ্ নিজেই সালাম; বরং তোমরা বল: ‘আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...........’ (সকল সম্ভাষণ, সালাত ও পবিত্র ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর প্রত্যেক বান্দাদের প্রতি। নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক্ক ইলাহ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল’।”[1]

অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বৈঠকে বসা সম্পর্কে বলেছেন,

«إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ»

“তোমরা যখন তাশাহহুদের সময় বসবে তখন অবশ্যই পড়বে ‘আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত্ত্বায়্যিবাতু”।[2]

এ হাদীসে আখেরী বৈঠককে রুকন হিসেবে বলা হয়েছে; কেননা শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ পড়া সালাতের রুকন।

১৩- সালাম ফিরানো। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০২।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৬৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

“পবিত্রতা হলো সালাতের চাবি, তার তাকবীর হলো (সালাত ব্যতীত সব কাজ) হারামকারী এবং তার সালাম হলো (সালাতের বাইরের সব কাজ) হালালকারী”।[1]

১৪- রুকনসমূহের মাঝে তারতীব তথা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। অতএব, তাকবীরে তাহরীমের আগে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না। আবার রুকুর আগে সাজদাহ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

“যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করো”। [2]

অতএব, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সালাত আদায় করেছেন সে ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে কেউ সালাত আদায় করলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ:

সালাতের ভিতরে কিছু কাজ করা ওয়াজিব। এসব কাজের কোনো একটি ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে; আর ভুলে বাদ পড়লে সাজদাহ সাহু দিতে হবে। সালাতের ওয়াজিবসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১- প্রত্যেক উঠা, নামা, বসা, ও দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা; তবে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলবে না। কেননা আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

---

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৫, আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ৬১; তিরমিযী, হাদীস নং ৩। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি এ পরিচ্ছেদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০০৮।

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে প্রত্যেক উঠা, নামা, দাঁড়ানো ও বসার সময় তাকবীর বলতেন”।[1]

২- রুকুতে কমপক্ষে একবার «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ‘সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আযীম’ বলা। কেননা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«...فَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، وَفِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

“অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর মধ্যে “সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আযীম” এবং সাজদাহয় “সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আ‘লা” পড়তেন”।[2]

৩- হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী সাজদাহয় «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ‘সুবাহানা রাব্বিয়াল ‘আ‘লা’ কমপক্ষে একবার পড়া।

৪- ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারী রুকু থেকে উঠার সময় «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলা। কেননা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ» ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» ثُمَّ يَقُولُ: وَهُوَ قَائِمٌ «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সালাত শুরু করতেন। তিনি রুকুতে যাওয়ার সময়ও তাকবীর বলতেন। তিনি রুকু থেকে পিঠ সোজা করে দাঁড়ানোর সময়

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৭১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় ‘রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’ বলতেন”।[1]

৫- ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী সালাত আদায়কারী রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়বে, «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ‘রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا قَالَ الإمام سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»

“ইমাম যখন “সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদা” বলে, তোমরা তখন “রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ” বলো”।[2]

৬- দু’সাজদাহর মাঝে দো‘আ পড়া। যেমন এ দো‘আ পড়া:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي»

“হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে নিরাপত্তা দিন, আমাকে হিদায়াত দিন এবং আমাকে রিযিক দান করুন”।[3]

অথবা এ দো‘আ পড়া,

«رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي»

“রাব্বিগ ফিরলী, রাব্বিগ ফিরলী” (হে আমার রব! আমায় ক্ষমা করুন, হে আমার রব! আমায় ক্ষমা করুন)।[4]

৭- প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৮- প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিফা‘আ ইবন রাফে‘ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯২।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪১১।

[3] আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৪, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[4] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

«إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ، فَكَبِّرِ اللَّهَ تَعَالَى، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ» وَقَالَ فِيهِ: «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ»

"সালাতে দাঁড়ালে প্রথমে তাকবীর তাহরীমা" বলার পর তুমি কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ হয় তা পাঠ করবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে আরও বলেন: "তুমি যখন সালাতের মধ্যে প্রথম বৈঠকে উপবেশন করো, তখন শান্তির সাথে (ধীরস্থিরভাবে) বসবে এবং এ সময় তোমার বাম পা বিছিয়ে (ইফতিরাশ পদ্ধতিতে) দিয়ে অতঃপর তাশাহুদ পাঠ করবে"।[1]

সালাতের সুন্নতসমূহ:

সালাতে কিছু সুন্নত কাজ রয়েছে, যা মুসল্লীকে পরিপূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্তির জন্য আদায় করতে হয়। নিম্নে এসব সুন্নত উল্লেখ করা হলো:

১- নিম্নোক্ত অবস্থায় কাঁধ বরাবর বা কান বরাবর হাত উঠানো সুন্নত।

ক- তাকবীরে তাহরীমার সময়।

খ- রুকুতে যাওয়ার সময়।

গ- রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময়।

ঘ- দু রাকা'আত শেষে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় হাত উঠানো।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত,

«أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ[2]، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رفعهما كذلك»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন কাঁধ বরারব দু হাত উঠাতেন। রুকুর তাকবীর বলার সময়ও তিনি কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন। রুকু হতে মাথা উঠালে তখনও কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন"।[3]

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৬০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[2] حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ হলো কাঁধ বরাবর।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯০।

তৃতীয় রাকা‘আতের জন্য দাঁড়ালে তখনও কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে। কেননা ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«كان إِذَا قَامَ من الركعتين رفع يديه»

“ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দু রাকা‘আত শেষে তৃতীয় রাকা‘আতের জন্য দাঁড়ালে দু’হাত উঠাতেন”।[1] তিনি এ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু‘ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২- বুকের উপর বা বুকের নিচে ও নাভীর উপরে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاَةِ»

“লোকদের নির্দেশ দেওয়া হতো যে, সালাতে প্রত্যেক ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখবে”।[2]

ওয়ায়েল ইবন হুজর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ»

“আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন”।[3]

৩- সালাতের শুরুতে নিম্নোক্ত দো‘আ পড়া,

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

---

[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪০। ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এ হাদীসটি মারফু‘ হাদীসের হুকুম।

[3] সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ৪৭৯। আলবানী রহ. হাদীসটির সনদকে দ‘য়ীফ বলেছেন; তবে হাদীসটি অন্যান্য বর্ণনায় তিনি সহীহ বলেছেন।

“হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বরকতপূর্ণ, আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোনো হক্ক ইলাহ নেই”।[1]

৪- প্রথম রাকা‘আতে চুপে চুপে ‘আউযুবিল্লাহ’ পড়া ও বাকী সব রাকা‘আতে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ٩٨ ﴾ [النحل: ٩٨]

“সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাও”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৮]

৫- সূরা ফাতিহা শেষে ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী সালাত আদায়কারী সব মুসল্লি কর্তৃক ‘আমীন’ বলা। কেননা হাদীসে এসেছে,

«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“ইমাম ‘ওয়ালাদ দওয়াল্লীন..’ পড়লে তোমরা ‘আমীন’ বলো। কেননা, যার এ (আমীন) বলা ফিরিশতাদের (আমীন) বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়”।[2]

«كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قَرَأَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقَالَ: "آمِينَ" يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ‘ওয়ালাদ-দওয়াল্লীন’ পড়তেন তখন তিনি ‘আমীন’ বলেছেন এবং এতে স্বর দীর্ঘ করেছেন”।[3]

৬- সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোনো কিরাত পড়া। আর তা হলো সূরা ফাতিহার পরে একটি সূরা বা এক বা দু আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করা। ফজরের দু

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৯। হাদীসের শব্দাবলী ইবন মাজাহ থেকে নেওয়া, হাদীস নং ৮০৪। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৮২।

[3] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৮৮৪২। শু‘আইব আরনাউত হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন।

রাকা‘আত ফরয, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার প্রথম দু রাকা‘আত ফরয সালাত সূরা ফাতিহার পরে উক্ত পরিমাণ এক বা দু আয়াত বা একটি সূরা মিলানো। কেননা আব্দুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর ও আসরের সালাতের প্রথম দু রাকা‘আতে সূরা ফাতিহার সাথে আরেকটি সূরা পড়তেন। কখনো কখনো তিনি কোনো কোনো আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন”।[1]

৭- জাহরী সালাত তথা যে সব সালাতে স্বশব্দে কিরাত পড়তে হয় তাতে কিরাত উচ্চস্বরে পড়া। আর সিররী সালাত তথা যে সব সালাতে নিম্নস্বরে কিরাত পড়তে হয় তাতে কিরাত নিম্নস্বরে পড়া। অর্থাৎ ফজর, মাগরিবের প্রথম দু রাকা‘আত ও ‘ইশার প্রথম দু’ রাকা‘আত সালাতে কিরাত উচ্চস্বরে পড়া, তাছাড়া বাকী সালাতে প্রত্যেক রাকা‘আতে কিরাত নিম্নস্বরে পড়া। এভাবে উচ্চস্বরে ও নিম্নস্বরে কিরাত পড়া শুধু ফরয সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দিনের বেলায় নফল সালাতে কিরাত নিম্নস্বরে পড়া আর রাতের বেলার নফল সালাতে মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটলে কিরাত কিছুটা উচ্চস্বরে পড়া মুস্তাহাব। তবে অন্যের ঘুম বা কষ্টের কারণ হলে নিম্নস্বরে কিরাত পড়া মুস্তাহাব।

৮- ফজরের সালাতে দীর্ঘ কিরাত পড়া। যোহর, আসর ও ইশার সালাত মধ্যম কিরাত পড়া। আর মাগরিবের সালাত কিরাত ছোট পড়া। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانَ - كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৭৮।

“আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের সাথে অমুকের চেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সালাত আর কারও পেছনে আদায় করি নি। বর্ণনাকারী সুলাইমান রহ. বলেন, তিনি যোহরের প্রথম দু রাকা‘আত লম্বা করতেন, শেষের দু রাকা‘আত সংক্ষিপ্ত করতেন। আর আসরের সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। আর মাগরিবের সালাত কিসারে মুফাসসাল দ্বারা আদায় করতেন। আর ইশার সালাত আওসাতে মুফাসসাল দ্বারা আদায় করতেন। আর ভোরের সালাত অর্থাৎ ফজর তিওয়ালে মুফাসসাল দ্বারা আদায় করতেন”।[1]

৯- সালাতে বসার পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত আছে। তিনি শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ ব্যতীত অন্যান্য বৈঠক ও বসাসমূহ ‘ইফতিরাশ’ সুরতে বসতেন (প্রথম বৈঠকে বা পায়ের উপর বসা এবং ডান পা বিছিয়ে দেওয়া)। আর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের সময় ‘তাওয়াররুক’ করে বসতেন (শেষ রাকা‘আতে বা পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা)। আবু হুমাইদ সা‘সা‘য়েদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সাহাবীগণের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করছিলেন। এতে তিনি বলেছেন,

«فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ»

“প্রথম বৈঠকে বাম পায়ের ওপর বসতেন এবং ডান পা বিছিয়ে দিতেন। আর যখন শেষ রাকা‘আতে বসতেন তখন বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন”।[2]

অতএব, ‘ইফতিরাশ’ হলো প্রথম বৈঠকে বাম পায়ের উপর বসা এবং ডান পা বিছিয়ে দেওয়া।

---

[1] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৮৯২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮২৮।

আর 'তাওয়াররুক' হলো শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের সময় বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা।

ফায়েদা: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদের সময় বাম হাত বাম হাঁটুর উপর আর ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন।

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতের মধ্যে বসতেন, তখন তিনি তাঁর বাম পা ও এর নলাকে ডান রানের নীচে রাখতেন, ডান পা বিছিয়ে দিতেন, বাম হাত বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন, ডান হাত ডান পায়ের রানের উপর স্থাপন করতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন"।[1]

«كان لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ ইশারা থেকে অগ্রসর হত না"।[2]

১০- সাজদাহ্তে দো'আ পড়া। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

"সাবধান! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে আমি যেন রুকু বা সাজদাহরত অবস্থায় কুরআন পাঠ না করি। তোমরা রুকু অবস্থায় মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৮৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৯০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

করবে এবং সাজদাহ রত অবস্থায় অধিক দো‘আ পড়ার চেষ্টা করবে; কেননা সে অবস্থা তোমাদের দো‘আ কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী”।[1]

১১- শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ দুরূদ পাঠ করা।

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

“হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ওপর সালাত পেশ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশধরদের ওপর সালাত পেশ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতিপ্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ওপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতিপ্রশংসিত, অতি মর্যাদায় অধিকারী”।[2]

১২- তাশাহহুদ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দো‘আ পাঠ করা। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَدْعُ بِأَرْبَعٍ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» “তোমাদের কেউ সালাত শেষ করলে (তাশাহহুদ ও দুরূদ পাঠ শেষ হলে) সে যেন চারটি

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৯।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭০। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৬।

দো‘আ পড়ে, এরপরে ইচ্ছামত অন্য দো‘আ পড়বে। দো‘আগুলো হলো, হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে জাহান্নাম ও কবরের ‘আযাব থেকে পানাহ চাই, জীবিতকাল ও মৃত্যুকালীন ফিতনা ও মাসীহ আদ-দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাই”।[1]

১৩- মুসল্লির বাম দিকে দ্বিতীয় সালাম ফিরানো। হাদীসে এসেছে,

«أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يرى بَيَاضَ خَدِّهِ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন। এমনকি তিনি এমনভাবে মুখ ঘুরাতেন যে তার গালের শুভ্র আভা দেখা যেতো”।[2]

১৪- সালাম শেষে কিছু যিকির ও দো‘আ পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সালাম ফিরানোর পরে কিছু যিকির ও দো‘আ এসেছে, সেগুলোর নির্বাচিত অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

ক- সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষে তিনবার أستغفر الله পড়তেন।

---

[1] সুনান আল-কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং ২৮৮৩। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৮। মুসলিমে হাদীসটি এভাবে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যখন শেষ তাশাহহুদ পাঠ করা শেষ করবে তখন যেন সে চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে”। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৮।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮২।

অতঃপর নিম্নোক্ত দো‘আ পড়া:

«اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

“হে আল্লাহ, তুমিই শান্তি, কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।"[1]

খ- মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার হাত ধরে বললেন,

«يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

“আল্লাহর কসম! হে মু‘আয, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ‘আল্লাহর কসম! হে মু‘আয, আমি তোমাকে ভালোবাসি। অতঃপর তিনি বলেন, ‘আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি তা প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পড়ে পড়তে ভুলবে না। তুমি বলবে, হে আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার যিকির, শুকর ও সুন্দরভাবে ইবাদাত করার তাওফীক দিন”।[2]

গ- মুগীরা ইবন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন:

«لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ»

“এক আল্লাহ ব্যতীত (সত্য) কোনো ইলাহ নাই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর ওপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই। আর আপনি কাউকে না দিলে তাকে কেউ দিতে পারবে না। আপনার কাছে (সৎকাজ ভিন্ন) কোনো সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না”। [3]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৯১।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫২২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৪৪। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৮।

ঘ-আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের শেষে তেত্রিশ বার আল্লাহর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে, তেত্রিশ বার আল্লাহর তাহমীদ বা প্রশংসা করবে এবং তেত্রিশ বার তাকবীর বা আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করবে আর এইভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করতে বলবে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও তাঁর কোনো শরীক নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম; তার গোনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হলেও মাফ করে দেওয়া হয়"।[1]

ঙ- আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ»

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে মৃত্যু ব্যতীত কোনো কিছু জান্নাতে প্রবেশে বাধা দিবে না"।[2]

চ- আমর ইবন মায়মুন আউদী রহ. থেকে বর্ণিত, শিক্ষক যেমন ছাত্রদের লেখা শিক্ষা দেন, সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তেমনি তাঁর সন্তানদের এ বাক্যগুলো শিক্ষা

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৯৭।

[2] সুনান আল-কুবরা লিন-নাসায়ী, হাদীস নং ৯৮৪৮; আল-'মুজাম আল-কাবীর, হাদীস নং ৭৫৩২। ইমাম হাইসামী রহ. মাজমাউয যাওয়ায়েদে (২/১৪৮) বলেন, হাদীসের সনদটি হাসান।

দিতেন এবং বলতেন: “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের পর এগুলো থেকে পানাহ চাইতেন, তিনি বলতেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»

“হে আল্লাহ! আমি ভীরুতা, অতিবার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের ‘আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই”।[1]

সালাতে যেসব কাজ করা জায়েয:

সালাতে মুসল্লীর জন্য কিছু কাজ করা বৈধ, সেগুলো হলো:

১- সালাতে ইমাম কিরাত ভুলে গেলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও কিরাত শুরু করা।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সালাত আদায় করতে কিরাত ভুলে যান। ফলে তিনি সালাত শেষ করে আমাকে বললেন,

«أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ؟ »

“তুমি কি আমাদের সাথে সালাত আদায় কর নি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে ভুলে যাওয়া কিরাত স্মরণ করিয়ে দিতে তোমাকে কে নিষেধ করেছে?”[2]

২- সালাতে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে যেমন, ইমাম ভুল করলে তাকে সতর্ক করা বা অন্ধকে পথ দেখানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরুষ তাসবীহ বলবে আর মেয়েলোক হাতে তালি দিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فإِنَّمَا التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮২২।

[2] ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২২৪২। শু‘আইব আরনাউত হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছেন।

“কারো সালাতের মধ্যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সে যেন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলে। হাততালি তো মেয়েদের জন্য।”।[1]

৩- সাপ, বিচ্ছু ও ক্ষতিকর প্রাণি হত্যা করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ»[2]

“কষ্টদায়ক দু’ কালো বস্তুকে তোমরা সালাতরত অবস্থায়ও হত্যা করবে: আর তা হচ্ছে, সাপ ও বিচ্ছু”।[3]

৪- কেউ সালাতের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে তাকে বাঁধা দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ»

“তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বস্তু মানুষদের থেকে সুতরা হিসেবে সামনে রেখে সালাতরত হয়, তখন যদি কোনো ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তবে সে যেন তাকে ইশারায় বাধা দেয়। অতিক্রমকারী যদি ইশারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তবে সে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে। কেননা সে একটা শয়তান”।[4]

৫- কেউ ডাকলে বা সালাম দিলে ইশারা দিয়ে তার উত্তর দেওয়া। জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুস্তালিক গোত্রের দিকে যাওয়ার সময় আমাকে কোনো এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি এসে দেখি তিনি তাঁর উটের উপর সালাত আদায়

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২১।

[2] اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ মূলত সাপ ও বিচ্ছুকে বুঝায়। الأسود দ্বারা সাপকেই বুঝানো হয়।

[3] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯২১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ৩৯০। তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[4] আবু দাউদ, হাদীস নং ৭০০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

করছেন। আমি ঐ অবস্থায়ই তাঁর সাথে কথা বললাম। হাত দ্বারা (চুপ করতে) ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী যুহাইর রহ. এ সময় তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে দেখালেন, আমি আবার কথা বললাম। আবার এরূপ ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী যুহাইর রহ. এবারও তাঁর হাত দ্বারা মাটির দিকে ইশারা করে দেখালেন। তখন আমি তার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। মাথায় ইশারা করে রুকু সাজদাহ করছিলেন। তারপর সালাত শেষ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

«مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي»

“আমি যে কাজে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, তার কী করেছ? আমি সালাত আদায় করছিলাম বলে তোমার কথার উত্তর দিতে পারি নি”।[1]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً»، قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ»

“একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাতরত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি তাঁকে সালাম দেই। এ সময় তিনি আঙ্গুলের ইশারায় এর জবাব দেন”।[2]

অতএব, এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কেউ ডাকলে বা সালামের জবাব দিতে হলে পুরো হাত দ্বারা বা মাথা নেড়ে বা আঙ্গুলের ইশারায় জবাব দেওয়া যায়।

৬- বাচ্চা বহন করা বা মুসল্লির সাথে মিশিয়ে নেওয়া জায়েয। আবু কাতাদা আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৪০।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯২৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا»

“আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সালাতে লোকদের ইমামতি করছেন আর তাঁর নাতনী উমামা বিনত আবিল ‘আস অর্থাৎ রাসূলের কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কন্যা তার কাঁধে উঠে আছে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকুতে যাচ্ছেন তখন তাকে (কাঁধ থেকে) নামিয়ে রাখছেন, আবার সাজদাহ থেকে উঠার পর পুনরায় কাঁধে উঠিয়ে নিচ্ছেন”।[1]

৭- প্রয়োজনে সামান্য হাঁটা। ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَحْمَدُ - يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ - قَالَ أَحْمَدُ: - فَمَشَى فَفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ»

“একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের দরজা বন্ধ করে সালাত আদায় করছিলেন। এ সময় আমি এসে দরজা খুলতে চাইলে তিনি দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় সালাতরত হন। হাদীসে আরও উল্লেখ আছে যে, দরজাটি কিবলামুখী ছিল”।[2]

৮- সামান্য কাজ করা, যেমন কাতার সোজা করার জন্য বা কাতার ঠিক করার জন্য সামনে, পিছনে, ডানে বা বামে সামান্য নড়াচড়া করা ও চলা বা মুসল্লীকে বা পাশ থেকে ডান পাশে নিয়ে আসা বা কাপড় ঠিক করা, কাশি দেওয়া, শরীর

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৪৩।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯২২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৪০২৭, শু‘আইব আরনাউত হাদীসের সনদটিকে হাসান বলেছেন।

চুলকানো, হাই তোলার সময় মুখের উপর হাত রাখা ইত্যাদি ছোট খাটো কাজ করা জায়েয। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي ميمونة، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ»

“একরাতে আমি আমার খালা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ঘরে রাত যাপন করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করতে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন তিনি আমার পিছন দিয়ে মাথায় ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন”। [1]

সালাতে মাকরূহসমূহ:

১- আকাশের পানে তাকানো। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ»، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ»

“লোকদের কি হয়েছে যে, তারা চক্ষু আকাশের দিকে তাকিয়ে সালাত আদায় করছে? এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, তারা অবশ্যই যেন উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের চক্ষুসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হবে”।[2]

২- কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো। যিয়াদ ইবন সুবাইহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার আমি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছিলাম। এ সময় আমি আমার হস্তদ্বয়কে কোমরের দুই পাশে স্থাপন করি। এতদ্দর্শনে সালাত শেষে তিনি আমাকে বলেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৯।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫০। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২৮।

«هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ»

“সালাতের সাথে এরূপ দণ্ডায়মান হওয়া শূলিকাষ্ঠের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন”।[1]

৩- প্রয়োজন ব্যতীত মাথা বা চোখ এদিক সেদিক হেলানো ও তাকানো। ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের মধ্যে (ঘাড় ফিরিয়ে) এদিক ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন,

«هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ»

“এটি শয়তানের ছোঁ মারা, সে মানুষের সালাত থেকে কিছু অংশ ছো মেরে নিয়ে যায়”।[2]

৪- অনর্থক কাজ করা বা এমন কাজ করা যা সালাত খুশু‘ (একাগ্রচিত্ত) নষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ»

“তোমরা সালাতের মধ্যে শান্ত থাকবে”।[3]

৫- মুসল্লী তার চুল, জামার হাতা বা জামার ওপর সাজদাহ দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا»

“আমাকে সাতটি হাড়ের সাহায্যে সাজদাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মাথার চুল ও কাপড় ধরে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে”।[4]

৬- একাধিকবার সাজদাহর স্থান থেকে পাথরকণা বা মাটি সরিয়ে সমান করা। মু‘আইকীব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মসজিদের মধ্যে

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯০৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫১।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩০।

[4] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯০।

অর্থাৎ সালাতরত অবস্থায় পাথর-টুকরা সরানো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

«إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً»

“যদি তোমাকে এরূপ (পাথর টুকরা সরানোর কাজ) করতেই হয়, তাহলে একবার মাত্র করতে পারো”।[1]

৭- সদল করে (তথা মাথার উপর থেকে দু’ কাধের উপর কিছু না রাখা মাটির দিকে প্রলম্বিত কাপড় পরিধান করে) সালাত আদায় করা ও সালাতে মুখ ঢেকে রাখা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«نَهَى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদল করে সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন এবং সালাতের সময় মুখ ঢাকতেও নিষেধ করেছেন”।[2]

৮- খাবার সামনে নিয়ে সালাত আদায় করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ»

“খাবার হাযির হলে কোনো সালাত পড়া চলবে না”।[3]

৯- পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়ে সালাত আদায় করা। কেননা উপরোক্ত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ[4]»

“খাবার হাযির হলে কোনো সালাত পড়া চলবে না। কিংবা পায়খানা পেশাবের বেগ নিয়েও সালাত পড়া চলবে না।[5]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৪৬।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৪৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬০।

4 الْأَخْبَثَانِ অর্থ পায়খানা পেশাব।

[5] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬০।

১০- প্রচণ্ড ঘুম পেলে সালাত আদায় করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ»

"সালাত আদায়ের অবস্থায় তোমাদের কারো যদি তন্দ্রা আসে তবে সে যেন ঘুমের রেশ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ, তন্দ্রাবস্থায় সালাত আদায় করলে সে জানতে পারবে না, হয়ত সে ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।[1]

সালাত নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ:

নিম্নোক্ত যে কোনো একটি কারণ পাওয়া গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়:

১- সালাতে ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে। এ ব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلًا»

"সালাত অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে"।[2]

২- ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত বহির্ভুত কোনো কথাবার্তা বা সালাত সংশোধনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কথা বলা। যায়িদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ»

"আমরা সালাতে কথাবার্তা বলতাম। প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তির সাথে আলাপ করত। অতঃপর (আল্লাহর জন্য দাঁড়াবে বিনীতভাবে) [সূরা আল-

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৮৬।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২১৬।

বাকারা, আয়াত: ২৩৮] এ আয়াতটি যখন নাযিল হলো, তখন চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরস্পরে আলাপ করতে নিষেধ করা হয়”।[1]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে বলেছেন,

«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»

“সালাতে মানুষের কথাবার্তা জাতীয় কোনো কিছু বলা ঠিক নয়। বরং তা তো কেবল- তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য”।[2]

তবে সালাতের মধ্যে সালাতের সংশোধনের জন্য কোনো কথা বলা যেমন, ইমাম কিরাত পড়তে ভুলে গেলে মুসল্লী কিরাত শুরু করে তাকে স্মরণ করে দেওয়া বা ইমাম সালাম ফিরিয়ে মুসল্লীদেরকে সালাত পূর্ণ হয়েছে কি-না জিজ্ঞেস করলে সালাত অপূর্ণ থাকলে মুসল্লীদের দ্বারা উত্তর দেওয়া এবং ইমাম কর্তৃক বাকী সালাত পূর্ণ করা ইত্যাদি সালাতের মধ্যে করলে ক্ষতি নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই এ ঘটনা ঘটেছে।

«فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»

‘যুলইয়াদাইন’ (দুই হাতাওয়ালা বা লম্বা হাতাওয়ালা) বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি ভুল করেছেন, না সালাত ছোট করা হয়েছে? তিনি বললেন, “আমি ভুলে যাইনি এবং (সালাত) ছোটও করা হয়নি”। তিনি সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, যুলইয়াদাইন কি ঠিক বলেছে? তারা বললেন, হ্যাঁ, ‘যুলইয়াদাইন’ সঠিক বলেছে। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বাকী দু’রাকা‘আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দু’টি সাজদাহ করলেন”।[3]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৯।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৭।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৫১।

৩- উল্লিখিত সালাতের কোনো রুকন বা শর্ত বাদ পড়লে যা সালাতের মধ্যে বা সালাতের পরে পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত ভুলকারীকে বলেছেন,

«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»

“ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় কর নি”।[1]

কেননা উক্ত ব্যক্তি সালাত ধীরস্থিরতা ও সোজা হয়ে উঠা বসার রুকন ছেড়ে দিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে বলেছেন।

৪- সালাতে অতিরিক্ত কাজ করা। কেননা এ ধরণের অতিরিক্ত কাজ করলে ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। যেমন, ইবাদতের পরিপন্থী কোনো কাজ করা, অন্তর ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সালাত ব্যতীত অন্য কাজ করা। তবে সামান্য কাজ যেমন, ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া বা কাপড় ঠিক করা, হাত দ্বারা শরীর চুলকানো ইত্যাদি সালাত নষ্ট করে না।

৫- অট্টহাসি হাসলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তাবাসসুম বা মুচকি হাসি হাসলে অনেক আলেমের মতে, তাতে সালাত নষ্ট হয় না।

৬- সালাতে ওয়াক্তের তারতীব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা। যেমন, মাগরিব না পড়ে ইশা আদায় করা। এতে ইশার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা সালাত ওয়াক্তের তারতীব তথা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ফরয। কেননা হাদীসে এক ওয়াক্ত সালাতের পরে অন্য ওয়াক্ত সালাতের কথা ধারাবাহিকভাবে এসেছে।

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৭।

৭- স্পষ্ট ভুল করা। যেমন, ইশার সালাত চার রাকা‘আতের পরিবর্তে আট রাকা‘আত পড়া। কেননা এতে প্রমাণ করে যে সে সালাত একাগ্র ছিল না, ফলে এ ধরণের বড় ভুল করেছে।

সাহু সাজদাহ

সালাতে ভুলের মাশুল (ক্ষতিপূরণ) দিতে মুসল্লি সালাত শেষে যে দু'টি সাজদাহ আদায় করে তাকে সাহু সাজদাহ বলে।

সাহু সাজদাহর কারণসমূহ:

তিন কারণে সাহু সাজদাহ দিতে হয়:

১- সালাতে কোনো কিছু অতিরিক্ত করলে।

২- সালাতে কম করলে।

৩- এবং সালাতে সন্দেহ হলে।

১- সালাতে কোনো কিছু অতিরিক্ত করলে।

কোনো ব্যক্তি সালাতে ভুলে রুকু, সাজদাহ বা অনুরূপ কোনো ফরয বা ওয়াজিব কাজ অতিরিক্ত করলে তাকে সালাত শেষে সালামের পরে দু'টি সাজদাহ দিতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعد ما سَلَّمَ»

"যোহরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার পাঁচ রাকা'আত আদায় করলেন। মুসল্লিগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী হয়েছে? সাহাবীগণ বললেন, আপনি যে পাঁচ রাকা'আত আদায় করছেন। তখন তিনি সালাম ফিরানোর পরে দু'টি সাজদাহ করলেন"।[1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭২।

“একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সালাত পাঁচ রাকা‘আত আদায় করেন। তখন মুসল্লীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সালাতে কি কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, তা কী? তাঁরা বললেন, আপনি যে পাঁচ রাকা‘আত সালাত আদায় করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি নিজের পা ঘুরিয়ে (কিবলামুখী হয়ে) দুই সাজদাহ (সাজদাহ সাহু) করে নিলেন”।[1]

কেউ সালাতে ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেললে একটু পরে মনে পড়লে সালাতের বাকী অংশ পূর্ণ করবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে, অতঃপর সাহু সাজদাহ দিবে, তারপরে আবার সালাম ফিরাবে। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيِ العَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ وَفِي القَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو اليَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের বিকালে সালাত ইমামতি করলেন। ইবন সীরীন রহ. বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকা‘আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে রাখা এক টুকরা কাঠের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর হাত বাঁ হাতের উপর রেখে এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭২।

মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন। যাদের তাড়া ছিল তারা মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সাহাবীগণ বললেন: সালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে? উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবু বকর এবং উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহুমাও ছিলেন। কিন্তু তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। আর লোকজনের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে “যুলইয়াদাইন” বলা হতো। তিনি বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি সালাত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তিনি বললেন: “আমি ভুলি নি এবং সালাত সংক্ষেপও করা হয় নি”। এরপর (অন্যদের) জিজ্ঞাসা করলেন: ‘যুলইয়াদাইন’ এর কথা কি ঠিক? তাঁরা বললেন হ্যাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং সালাতের বাদপড়া অংশটুকু আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন ও তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সাজদাহর মতো বা একটু দীর্ঘ সাজদাহ করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। পরে আবার তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সাজদাহর মতো বা একটু দীর্ঘ সাজদাহ করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। লোকেরা প্রায়ই ইবন সীরীন (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করতো “পরে কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন?” তখন ইবন সীরীন রহ. বলতেন: আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমরান ইবন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন: “তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন”।[1]

২- সালাতে কোনো কিছু কম বা অপূর্ণ করলে:

কেউ সালাতের কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সালাম ফিরানোর পূর্বে দু’টি সাজদাহ দিবে। যেমন, কেউ প্রথম বৈঠকের তাশাহহুদ ভুলে গেলে তৎক্ষণাৎ মনে না পড়লে বা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে মনে পড়লে তখন আর তাশাহহুদের

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮২।

বৈঠকে ফিরে না গিয়ে সালামের পূর্বে সাজদাহ সাহু দিবে। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন বুহায়না রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ»

"কোন এক সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চার রাকা'আত বিশিষ্ট সালাতে) দু' রাকা'আত সালাত পড়ে না-বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লিগণও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন সালাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর আগে তাকবীর বলে বসে বসেই দু'টি সাজদাহ করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন"।[1]

৩- সালাতে বেশি বা কমের সন্দেহ হলে:

সালাতে মুসল্লি তিন বা চার রাকা'আতের সন্দেহ হলে নিম্নোক্ত দু অবস্থা হতে পারে:

ক- বেশি বা কমের প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে সালাত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরানোর পরে সাহু সাজদাহ দিবে। দলীল হলো: আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ»

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২২৪।

“তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহে হওয়ার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। তারপর সে যেন সালাম ফিরিয়ে দু’টি সাজদাহ দেয়”।[1]

খ- বেশি বা কমের কোনটিই যদি প্রধান্য না পায় তবে ইয়াকীন তথা নিশ্চিত সংখ্যার ওপর আমল করবে, অর্থাৎ কম সংখ্যক রাকা‘আতের ওপর ভিত্তি করে সালাত পূর্ণ করবে এবং ভুলের জন্য সালামের পূর্বে সাজদাহ সাহু দিবে। এ ব্যাপারে দলীল হলো: আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»

“তিন রাকা‘আত পড়া হলো না চার রাকা‘আত পড়া হলো- সালাতের মধ্যে তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হলে সে যে কয় রাকা‘আত পড়েছে বলে নিশ্চিত হবে সেই কয় রাকা‘আতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট করণীয় করবে। এরপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু’টি সাজদাহ করবে। (এখন) সে যদি আগে পাঁচ রাকা‘আত পড়ে থাকে তাহলে এ দুই সাজদাহ দ্বারা তার সালাতের জোড়া পূর্ণ হয়ে (ছয় রাকা‘আত হয়ে) যাবে। আর যদি তার সালাত চার রাকা‘আত হয়ে থাকে তাহলে (এই) সাজদাহ দু’টি শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল হবে”।[2]

মূলকথা হলো: সাজদাহ সাহু সালামের পূর্বে বা সালামের পরে দিতে হয়। দু জায়গায় সালামের পরে সাজদাহ সাহু দিতে হয়:

প্রথম: সালাত নির্ধারিত কাজের অতিরিক্ত করলে।

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০১।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭১।

দ্বিতীয়: সালাত সন্দেহ হলে কোনো একটিকে প্রধান্য দিলে সালামের পরে সাহু সাজদাহ দিতে হয়।

আর সালামের আগে সাহু সাজদাহ দিতে হয় দু স্থানে:

প্রথম: সালাত নির্ধারিত কাজের কম করলে।

দ্বিতীয়: বেশি কমের সন্দেহ হলে যদি কোনো একটিকে প্রধান্য দেওয়া সম্ভব না হয় তখন কম নিশ্চিত সংখ্যক ধরে সালাতের বাকী অংশ পূর্ণ করে সালামের পূর্বে সাহু সাজদাহ দিতে হয়।

সাহু সাজদাহর পরিশিষ্ট:

১- মুসল্লি সালাতের কোনো ফরয (রুকন) বাদ দিলে ছেড়ে দেওয়া রুকনটি যদি তাকবীরে তাহরীমা হয়, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে ছুটে যাক তার সালাত আদায় হবে না। কেননা তার সালাত শুরুই করা হয় নি। আর যদি ছুটে যাওয়া ফরযটি তাকবীরে তাহরীমা না হয়, তবে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলে ছুটে যায় তবে দ্বিতীয় রাকা'আতে যদি তা পাওয়া যায় তবে প্রথম রাকা'আতের ছুটে যাওয়া ফরযটি বাতিল হয়ে যাবে এবং উক্ত দ্বিতীয় রাকা'আত প্রথম রাকা'আতের স্থলাভিষিক্ত হবে ও সেখান থেকে সালাত পূর্ণ করবে। আর যদি ছুটে যাওয়া ফরযটি দ্বিতীয় রাকা'আতে পাওয়া না যায় তবে তাকে অবশ্যই সে ফরযটি পুনরায় আদায় করতে হবে। তখন সালাত ছুটে যাওয়া উক্ত ফরযটি আদায় করে অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করবে। উভয় অবস্থাতেই সালামের আগে বা পরে সাজদাহ সাহু আদায় করতে হবে।

২- সালামের পরে সাজদাহ সাহু দিলে তাকে পুনরায় সালাম ফিরাতে হবে।

৩- মুসল্লি ইচ্ছাকৃত কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর ভুলে ছুটে গেলে এবং উক্ত ওয়াজিবটি শেষ হওয়ার আগেই মনে পড়ে যায় তবে সেটি আদায় করবে ও এজন্য তাকে কোনো সাহু সাজদাহ দিতে হবে না। আর ওয়াজিবটি আদায়ের সুযোগ চলে গেলে পরের রুকন শুরু করার আগে মনে পড়লে ফিরে গিয়ে উক্ত ওয়াজিবটি আদায় করে সালাতের

অবশিষ্টাংশ আদায় করবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে, অতঃপর সাজদাহ সাহু আদায় করে আবার সালাম ফিরাবে। আর যদি পরের রুকন আদায় করার পরে ছুটে যাওয়া ওয়াজিবটি মনে পড়ে তবে সেখানে আর ফিরে যাবে না। তার উক্ত ওয়াজিবটি বাদ হয়ে যাবে, সালাতের বাকী অংশ যথারীতি আদায় করে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাজদাহ সাহু দিবে যেভাবে প্রথম বৈঠকের তাশাহহুদ ছুটে গেলে সাজদাহ সাহু দিতে হয় সেভাবে সাজদাহ সাহু দিবে।

সালাত আদায়ের পদ্ধতি:

১- মুসলিমগণ সালাতের ওয়াক্ত হলে পবিত্র হয়ে সতর ঢেকে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিবলামুখী করে দাঁড়াবে।

২- যে ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে মনে মনে সে ওয়াক্তের সালাতের নিয়ত করবে, মুখে উচ্চরণ করবে না।

৩- 'আল্লাহু আকবর' তথা তাকবীরে তাহরীমা বলে কাঁধ বরাবর হাত উঠিয়ে হাত বাঁধবে।

৪- বুকের উপর বা বুকের নিচে ও নাভীর উপরে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধবে।

৫- অতঃপর 'আউযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' বলে সালাত শুরু করবে ও সূরা ফাতিহা পড়বে। সূরা ফাতিহা শেষ করে 'আমীন' বলবে।

৬- এরপরে অন্য একটি সূরা বা কুরআনের যেকোনো জায়গা থেকে তার জন্য যা সহজ হয় সেখান থেকে পড়বে।

৭- অতঃপর কাঁধ বরাবর হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে রুকুতে যাবে। হাতের তালু দিয়ে হাঁটু ধরবে, পিঠ সামনে হেলিয়ে দিবে। পিঠ ও মাথা সমান রাখবে, উঁচু নিচু হবে না। হাতের আঙ্গুলসমূহ হাঁটুর উপর খোলা থাকবে।

৮- রুকুতে «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» (সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম) তিন বা ততোধিকবার বলবে।

৯- রুকু থেকে উঠার সময় سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলে কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ রাব্বানা) (ওয়ালাকাল হামদ বলবে।

১০- ‘আল্লাহু আকবর’ বলে সাজদায় যাবে। সাত অঙ্গে সাজদাহ দিবে। তা হলো: নাক, কপাল, দু হাতের তালু, দু হাঁটু, দু পায়ের আঙ্গুলসমূহ। সাজদাহর সময় খেয়াল রাখবে হবে যে, নাক ও কপাল যেন মাটিতে লেগে থাকে, দু হাতের কনুই যেন শরীরের সাথে লেগে না থাকে বা জমিনে বিছিয়ে না থাকে; বরং মাটি ও শরীরে লেগে থাকা অবস্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রসারিত করে ফাঁক রাখবে। আর হাতের আঙুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখবে।

১১- সাজদায় তিন বা ততোধিক বার «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» (সুবহানা রাব্বিয়াল আ‘লা) বলবে।

১২- ‘আল্লাহু আকবর’ বলে সাজদাহ থেকে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তাতে বসবে ও ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ খাড়া করে রাখবে। বসে «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» এ দো‘আ পড়বে।

১৩- অতঃপর দ্বিতীয় সাজদাহ দিবে। একইভাবে সাজদাহ শেষে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য সূরা মিলিয়ে যথারীতি রুকু সাজদাহ করে দ্বিতীয় রাকা‘আত শেষ করবে। দু রাকা‘আত বিশিষ্ট সালাত হলে দ্বিতীয় রাকা‘আত শেষে তাশাহহুদের জন্য বসে তাশাহহুদ, দুরূদ ও দো‘আ পড়ে السلام عليكم ورحمة الله (আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ) বলে প্রথমে ডানে সালাম ফিরাবে, অতঃপর বাম দিকে একইভাবে সালাম ফিরাবে।

১৪- আর দুয়ের অধিক রাকা‘আতবিশিষ্ট সালাত হলে প্রথক বৈঠক শেষে আত্তাহিয়্যাতু শেষ করে আবার দাঁড়াবে, তাকবীরের সাথে কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে। অতঃপর যথারীতি সালাতের অবশিষ্ট রাকা‘আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী সালাতের বাকী অংশ শেষ করে

‘তাওয়াররুক’ পদ্ধতিতে বসবে। আর তা হলো: শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের সময় বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা।

হাত রানের উপর রাখবে, অতঃপর তাশাহহুদ, দুরূদ, কিছু দো‘আয় মাসূরা যেমন, জাহান্নাম, কবরের ‘আযাব, জীবন-মৃত্যু ফিতনা ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাওয়া।

১৬- অতঃপর আওয়াজ করে السلام عليكم ورحمة الله(আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ) বলে প্রথমে ডানে সালাম ফিরাবে, অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরাবে।

জামা'আতে সালাত আদায়

জামা'আতে সালাত আদায়ের হুকুম:

ওযর ব্যতীত প্রত্যেক মুমিনের ওপর জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এখানে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো:

১- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ»

"এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই। তাকে বাড়িতে সালাত পড়ার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন জানালো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাড়িতে সালাত পড়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকটি যে সময় ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ (আমি আযান শুনতে পাই)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি মসজিদে আসবে"।[1]

২- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৩।

“‘ইশা ও ফজরের সালাত পড়া মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানতো যে এ দু’টি সালাতের পুরস্কার বা সাওয়াব কত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা বুক হেঁচড়ে হলেও তারা এ দু’ওয়াক্তে জামা‘আতে হাযির হতো। আমি ইচ্ছা করেছি সালাত পড়ার আদেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি; আর আমি জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ কিছু লোককে নিয়ে যারা সালাতের জামা‘আতে আসে না তাদের কাছে যাই এবং আগুন দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই”।[1]

৩- আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ»

“যখন কোনো জনবসতি কিংবা মরুচারী এলাকায় তিনজন লোক একত্রিত থাকার পরও জামা‘আতে সালাত আদায় না করে তখন শয়তান তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অতএব, (তোমরা) অবশ্যই জামা‘আতের সাথে সালাত আদায় করো। কেননা দলচ্যুত বকরীকেই কেবল নেকড়ে বাঘ ভক্ষণ করে থাকে”।[2]

৪- ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

“যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং জামা‘আতে উপস্থিত হলো না, তার কোনো সালাত নেই, যদি না তার কোনো শরী‘আতসম্মত ওযর থাকে।”[3]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫১।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৪৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। নাসায়ী, হাদীস নং ৮৪৭। মুসতাদরকে হাকেম, হাদীস নং ৭৬৫। ইমাম হাকেম হাদীসের রাবীদেরকে সদুক বলেছেন।

[3] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৭৯৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫- আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ»

“যে ব্যক্তি আগামীকাল কিয়ামতের দিন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পেতে আনন্দবোধ করে সে যেন ঐসব সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে যখনই এবং যেখানেই সেগুলোর জন্য আযান দেওয়া হয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের পন্থা ও পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব সালাতও হেদায়াতের পন্থা ও পদ্ধতি। এ ব্যক্তি যেমন সালাতের জামা‘আতে হাযির না হয়ে বাড়িতে সালাত পড়েছে অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়িতে সালাত পড়ো তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত বা পন্থা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নবীর সুন্নত বা পদ্ধতি পরিত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (সালাত পড়ার জন্য) কোনো একটি মসজিদে হাযির হয় তাহলে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ করবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য একটি করে সাওয়াব লিখে দেন। তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন। ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা আমাদের দেখেছি, সর্বজনবিদিত মুনাফিক ব্যতীত কেউই জামা‘আতে সালাত পড়া ছেড়ে

দিত না। এমন ব্যক্তি জামা‘আতে হাযির হতো যাকে দু’জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো”।[1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«إِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হিদায়াতের কথা শিখিয়েছেন। আর হিদায়াতের কথা ও পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যে মসজিদে আযান অনুষ্ঠিত হয় সে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা।”[2]

জামা‘আতে সালাত আদায়ের ফযীলত:

একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে জামা‘আতে সালাত আদায় করলে রয়েছে অনেক ফযীলত। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস এসেছে। সেগুলোর কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো:

১- ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

“কোনো ব্যক্তির জামা‘আতে সালাত পড়া তার একাকী সালাত পড়া থেকে সাতাশগুণ বেশি মর্যাদাসম্পন্ন”।[3]

২- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৪।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৪।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫০।

الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ»

“কোনো ব্যক্তি মসজিদে জামা‘আতে সালাত পড়লে তা তার বাড়িতে বা বাজারে সালাত পড়ার চেয়ে বিশগুণেরও বেশি মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ কোনো লোক যখন সালাতের জন্য অযু করে এবং ভালোভাবে অযু করে মসজিদে আসে, তাকে কেবল সালাতই মসজিদে নিয়ে আসে, আর সে কেবল সালাতই উদ্দেশ্য নেয়, তখন এ উদ্দেশ্যে সে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করে মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের বদলে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ যেন সে সালাতে রত থাকল। আর তোমাদের কেউ যখন সালাত পড়ার পর সালাতের স্থানেই বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতারা তার জন্য এ বলে দো‘আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ, তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করো। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি তার তওবা কবুল করো। এরূপ দো‘আ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকে যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার অযু নষ্ট করে”।[1]

ইমামের সাথে একজন মুসল্লী হলেই জামা‘আত হয়:

ইমামের সাথে পুরুষ বা নারী বা শিশু যে কোনো একজন হলেই জামা‘আত সংঘটিত হয়। জামা‘আতে লোকসংখ্যা যতোই বেশি হবে আল্লাহর কাছে তা ততোই প্রিয় ও অধিক সাওয়াবের।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪৯।

«بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي ميمونة، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ»

“এক রাতে আমি আমার খালা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ঘরে রাত যাপন করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সঙ্গে আমি সালাত আদায় করতে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার পিছন দিয়ে মাথায় ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন”।[1]

আবু সা‘ঈদ ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ»

“কোনো ব্যক্তি যদি রাতের বেলায় নিজে জাগ্রত হয় ও তার স্ত্রীকে জাগ্রত করে দু’জনে সালাত আদায় করে, অথবা দু’জন একত্রে (জামা‘আতে) দু রাকা‘আত সালাত আদায় করে, তবে আল্লাহর অধিক স্মরণকারী বান্দা ও বান্দীদের কাতারে তাদের নাম লেখা হয়”।[2]

অনুরূপ আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (জামা‘আতের পর) একাকী সালাত আদায় করতে দেখে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৯।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩০৯। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

নেই যে এ ব্যক্তিকে সদকা দিয়ে তার সাথে একত্রে সালাত পড়তে পারে? ফলে একজন লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে তার সাথে সালাত আদায় করলো”।[1]

উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى[2] مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى»

“নিশ্চয় মানুষের একাকী সালাত আদায় করা থেকে অপর জনের সাথে সালাত আদায় করা অধিক উত্তম আর দু’জনের সাথে সালাত আদায় করা এক জনের সাথে সালাত আদায় করা থেকে উত্তম। এর অধিক জামা‘আতে যতোই লোক বেশি হবে ততোই তা মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়”।[3]

মহিলাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং তাদের জন্য ঘরে সালাত আদায়ের ফযীলত:

মহিলাদের মসজিদে জামা‘আতে শরিক হওয়া জায়েয; তবে শর্ত হলো তারা যৌন উত্তেজনাকর ও ফিতনায় আহ্বানকারী পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা ও সুগন্ধি থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ»

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৭৪। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১১৮০৮। আল্লামা শু‘আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি সহীহ।

2 أَزْكَى অর্থ অধিক উত্তম, মর্যদাসম্পন্ন, মুসল্লীর জন্য অধিক পবিত্রকরণ ও অধিক গুনাহ মাফ হয়। কেননা জামা‘আতের কারণে রহমত ও প্রশান্তি নাযিল হয়; যা একাকী থাকলে হয় না।

[3] আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৫৪। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৮৪৩।

“তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (মহিলাদেরকে) আল্লাহর মসজিদে যাতায়াতে নিষেধ করো না। অবশ্য তারা যেন মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয় খুশবুবিহীন”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ»

“যে নারী সুগন্ধি-ধোঁয়া নিয়েছে, সে যেন আমাদের সাথে ‘ইশার জামা‘আতে শরীক না হয়”।[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ»

“যে নারী সুগন্ধি মেখে মসজিদে যায় তার সালাত কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে গোসল করে নেয়”।[3]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»

“তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদে যাতায়াতে বাধা দিও না; তবে তাদের ঘরসমূহই তাদের (সালাতের জন্য) উত্তম স্থান”।[4]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৬৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৪৪০৬। শু‘আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি মারফু‘ সহীহ লিগাইরিহী।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪৪।

[3] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০০২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[4] আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৬৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

“মহিলাদের ঘরে সালাত আদায় করা, বৈঠকখানায় সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে সালাত আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে সালাত আদায় করা অধিক উত্তম”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ»

“মহিলাদের সর্বোত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘরের গোপন প্রকোষ্ঠ”।[2]

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৭০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ ইবন খুজাইমা, হাদীস নং ১৬৮৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৬৫৪২। শু‘আইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

সালাতুল জুমু‘আ

জুমু‘আর সালাতের হুকুম:

জুমু‘আর দু রাকা‘আত সালাত পুরুষের ওপর ফরয। এ সালাত ফরয হওয়ার দলীল হলো:

১- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ ﴾ [الجمعة: ٩]

“হে মুমিনগণ, যখন জুমু‘আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটিই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে”। [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ৯]

২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»

“যারা জুমু‘আর সালাত ত্যাগ করে তাদেরকে এ অভ্যাস বর্জন করতে হবে। নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে সীল মেরে দিবেন, অতঃপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে”।[1]

৩- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ»

“আমার ইচ্ছা হয় যে এক ব্যক্তিকে সালাতের ইমামতি করার নির্দেশ দেই আর আমি গিয়ে যারা জুমু‘আর সালাত পড়তে আসে না, আগুন লাগিয়ে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেই”।[2]

৪ -রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬৫।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫২।

" الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ "

“জুমু‘আর সালাত প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জামা‘আতের সাথে আদায় করা ফরয দায়িত্ব। কিন্তু চারজন এর ব্যতিক্রম: ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থব্যক্তি”।[1]

৫- ইজমা: সব আলেম একমত যে, জুমু‘আর সালাত আদায় করা ফরয।

জুমু‘আর দিনের ফযীলত:

জুমু‘আর দিন খুবই বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ দিন। এটি দিবসসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও ফযীলতপূর্ণ দিন। সত্যবাদী ও সত্য বলে স্বীকৃত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا»

“যে সব দিনে সূর্যোদয় হয় তার মধ্যে জুমু‘আর দিনই সর্বোত্তম। এ দিনেই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনই তাঁকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ দিনই তাঁর তাওবা কবুল হয়েছে এবং এ দিনে তিনি মারা যান। আর এ দিনেই কিয়ামত কায়েম হবে, এ দিন জিন্ন ও ইনসান ব্যতীত সমস্ত প্রাণী সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। এ দিনের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, কোনো মুসলিম বান্দা সে সময় সালাতে রত থেকে আল্লাহর নিকট যা কিছুই প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে তা প্রদান করবেন।”।[2]

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৬৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৪৬। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। নাসায়ী, হাদীস

জুমু‘আর দিনের মুস্তাহাব ও আদবসমূহ:

১- গোসল করা, সাজ-সজ্জা ও সুন্দর কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও মিসওয়াক করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

“জুমু‘আর দিনে গোসল করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ».

“প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির ওপর কর্তব্য হচ্ছে জুমু‘আ বারে গোসল করা ও মিসওয়াক করা আর সামর্থ্য অনুযায়ী সুগন্ধি স্পর্শ করবে”।[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ - أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»

“তোমাদের কারো পক্ষে বা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হলে নিজেদের সচরাচর পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া-জুমু‘আর সালাতের জন্য পৃথক দুইটি কাপড়ের ব্যবস্থা করে নেবে”।[3]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন,

«حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ السِّوَاكُ وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ إن كان».

“প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো জুমু‘আর দিনে মিসওয়াক করা, গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা (নিজের না থাকলেও) তার স্ত্রীর সুগন্ধি থেকে হলেও”।[4]

নং ১৪৩০।

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৪৬।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৪৬।

[3] আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৭৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১০৯৬। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[4] মুসনাদ বাযযার, হাদীস নং ৪১৭১। হাদীসটি সহীহ।

২- তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়া: জুমু‘আর সালাত আদায় করতে ওয়াক্ত হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই মসজিদে যাওয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»

“যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন জানাবাত গোসলের (ফরয গোসল) ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন, একটি উট নৈকট্যের জন্য পেশ করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন, একটি গাভী নৈকট্যের জন্য পেশ করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা নৈকট্যের জন্য পেশ করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী নৈকট্যের জন্য পেশ করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন, একটি ডিম নৈকট্যের জন্য পেশ করল। পরে ইমাম যখন খুৎবা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফিরিশতাগণ যিকির শোনার জন্য হাযির হয়ে যান (তখন আর কারও নাম লিখেন না)”। [1]

৩- ইমাম মিম্বারে উপবিষ্ট হওয়ার আগে নফল সালাত আদায় করা। তবে ইমাম যখন খুৎবা দেওয়ার জন্য মিম্বারে উপবিষ্ট হবেন তখন নীরবে শুধু ‘তাহিয়্যাতুল মসজিদ’ এর দু রাকা‘আত সালাত আদায় করে বসে পড়বে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى ما لم يغش الكبائر»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৫০।

“যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল থেকে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে এরপর বের হয় এবং দু‘জন লোকের মাঝে বিচ্ছিন্ন না করে, তারপর তার নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেওয়ার সময় চুপ থাকে, তাহলে উক্ত জুমু‘আ থেকে পরের জুমু‘আ পর্যন্ত তার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যতক্ষণ না সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»

“তোমাদের কেউ জুমু‘আর দিনে মসজিদে আসার পর ইমামকে খুৎবারত অবস্থায় পেলে সে যেন দু’ রাকা‘আত সালাত (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) পড়ে নেয়, তবে সে যেন উক্ত রাকা‘আতদ্বয় সংক্ষেপে আদায় করে।”।[2]

৪- লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাওয়া ও দু‘জন লোকের মাঝে বিচ্ছিন্ন করা মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। সে লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন,

«اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ»

“তুমি বসো, তুমি (অন্যকে) কষ্ট দিয়েছ এবং অনর্থক কাজ করেছ”।[3]

উপরের হাদীসে এসেছে,

«ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ..... إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى»

“এবং দু‘জন লোকের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করে বসে পড়ে... তাহলে উক্ত জুমু‘আ থেকে পরের জুমু‘আ পর্যন্ত তার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে”।[1]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৮৩।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৭৫।

[3] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১১১৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫- ইমাম খুৎবার জন্য বের হলে কথাবার্তা বন্ধ রাখা ও পাথরের টুকরা বা অন্য কোনো কিছু হাতে নিয়ে অনর্থক নড়াচড়া না করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ»

"জুমু'আর দিনে ইমামের খুৎবা প্রদানকালে তুমি যদি তোমার সঙ্গীকে বল চুপ থাক, তবে তুমিও অনর্থক কথা বললে"। [2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর জুমু'আর সালাতে এলো, নীরবে মনোযোগ সহকারেখুৎবা (আলোচনা) শুনলো, তার পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং আরও অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি কঙ্কর স্পর্শ করলো সে অনর্থক কাজ করলো"। [3]

৬- জুমু'আর আযান হলে বেচা কেনা করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩ ﴾ [الجمعة: ٩]

"হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে"। [সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত: ৯]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৮৩।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৫১।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৫৭।

৭- জুমু‘আর দিনে ও রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বেশি বেশি সালাত ও সালাম পেশ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ»

“তোমরা জুমু‘আর দিনে আমার প্রতি বেশি বেশি সালাত পেশ করো; কেননা যে কেউ আমার প্রতি জুমু‘আর দিনে সালাত পেশ করবে তার সেটা আমার কাছে পেশ করা হয়”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا»

“তোমরা জুমু‘আর দিনে ও রাতে আমার প্রতি বেশি বেশি সালাত পাঠ করো। যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রতি দশবার সালাত পেশ করবেন”।[2]

৮- সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»

“যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিনে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে তাকে সে জুমু‘আ থেকে পরবর্তী জুমু‘আ পর্যন্ত নূর দ্বারা আলোকিত করা হবে”।[3]

---

[1] মুসতাদরাক লিলহাকিম, হাদীস নং ৩৫৭৭। ইমাম হাকিম বলেন, হাদীসের সনদটি সহীহ। সনদের আবু রাফি হলো ইসমাইল ইবন রাফি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন নি।

[2] সুনান আল-বায়হাকী, ৫৯৯৪। হাদীসের সনদটি হাসান।

[3] মুসতাদরাক লিলহাকিম, হাদীস নং ৩৩৯২। ইমাম হাকিম রহ. বলেন, হাদীসের সনদটি সহীহ; কিন্তু বুখারী ও মুসলিম এ সনদে বর্ণনা করেন নি। ইমাম যাহাবী রহ. বলেছেন, নু‘আইম ইবন হাম্মাদ থেকে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণিত আছে।

৯- জুমু‘আর দিনে দো‘আ কবুল হওয়ার সময় বেশি বেশি দো‘আ করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

“জুমু‘আর দিনের মধ্যে অবশ্যই এমন একটি মুহূর্ত আছে কোনো মুসলিম সে সময় আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করলে নিশ্চয় তিনি তাকে তা দান করেন”।[1]

অন্য হাদীসে এসেছে, এ সময়টি জুমু‘আর দিনের শেষ সময় তথা বিকেল বেলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ - سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»

“জুমু‘আর দিনের বার ঘন্টার মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, তখন কোনো মুসলিম আল্লাহর নিকট যা-ই চাইবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে তা-ই প্রদান করেন। তোমরাসেটাকে আসরের পরের মুহূর্তে সন্ধান করো”।[2]

১০- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ[3] يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا»، قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، فَقُلْتُ: «بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ»، قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৫২।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৪৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ে ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে।

أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هُوَ ذَاكَ.

“যে সব দিনে সূর্যোদয় হয় তার মধ্যে জুমু‘আর দিনই সর্বোত্তম। এ দিনেই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এ দিনই তাঁকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, এ দিনই তাঁর তাওবা কবুল হয় এবং এ দিনই তিনি মারা যান। এ দিনই কিয়ামত কায়েম হবে, এ দিন জিন ও ইনসান ব্যতীত সমস্ত প্রাণি সুবহে সাদেক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। এ দিনের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, তখন কোনো মুসলিম বান্দা সালাত আদায়ে থেকে আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করবে তা-ই প্রাপ্ত হবে। কা‘ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এরূপ দো‘আ কবুলের সময় সারা বছরের মধ্যে মাত্র এক দিন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, বছরের একটি দিন নয়, বরং এটি প্রতি জুমু‘আর দিনের মধ্যে নিহিত আছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর কা‘ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার প্রমানস্বরূপ তাওরাত পাঠ করে বলেন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, অতঃপর আমি বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করি (যিনি ইয়াহূদীদের মধ্যে বিজ্ঞ আলিম ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করি। এ সময় কা‘ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, দো‘আ কবুলের সেই বিশেষ সময় সম্পর্কে আমি জ্ঞাত আছি। তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমাকে ঐ সময় সম্পর্কে অবহিত করুন। আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তা হলো জুমু‘আর দিনের সর্বশেষ সময়। আমি বললাম, তা জুমু‘আর দিনের

সর্বশেষ সময় কীরূপে হবে? অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো বান্দা সালাতে থেকে উক্ত সময়ে দো‘আ করলে তার দো‘আ কবুল হবে। অথচ আপনার বর্ণিত সময়ে কোনো সালাত আদায় করা যায় না। আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন নি যে, কোনো ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকলে সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তাকে সালাতরত হিসাবে গণ্য করা হয়? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এটাও সে রকম”। [1]

কেউ কেউ বলেন, এ সময়টি হলো ইমাম মিম্বারে বসা থেকে সালাত শেষ করা পর্যন্ত মুহুর্ত।

জুমু‘আর সালাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

প্রত্যেক মুসলিম, পুরুষ, স্বাধীন, বালেগ, সুস্থ ও মুকিমের (মুসাফির নয়) ওপর জুমু‘আর সালার ফরয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»

“জুমু‘আর সালাত প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জামা‘আতের সাথে আদায় করা ফরয কর্তব্য। কিন্তু চার জন এর ব্যতিক্রম: ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থব্যক্তি”। [2]

মুসাফিরের ওপর জুমু‘আর সালাত ফরয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ, উমরা, জিহাদ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সফর করেছেন; কিন্তু সফরে তার থেকে জুমু‘আর সালাত আদায়ের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে একটি আছার বর্ণিত আছে যে,

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৪৬। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৬৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

«أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةَ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْرُجْ، فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ»

"তিনি এক ব্যক্তির মাঝে সফরের আলামত দেখলেন, তখন তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আজকে জুমু'আর দিন না হলে সফর করতাম। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে বললেন, তুমি সফরে বের হও, কেননা জুমু'আর সালাত সফরকে বাধা দেয় না (আটকে রাখে না)"।[1]

জুমু'আর সালাত সহীহ হওয়ার শর্তাবলী:

জুমু'আর সালাত সহীহ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে, তা হলো:

১- জুমু'আর সালাত জনপদ বা জনপদের নিকটস্থ অঞ্চল বা শহরে আদায় করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে শহর বা জনপদ ছাড়া জুমু'আর সালাত আদায় করা হতো না। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনদেরকে জুমু'আর সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন নি। সফরে যেমন তার থেকে জুমু'আর সালাত আদায়ের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না তেমনি বেদুইনদের ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

২- জুমু'আর সালাতে দু'টি খুৎবা থাকা শর্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের দু'টি খুৎবা দিয়েছেন এবং তার থেকে সর্বদা এ কাজটি পাওয়া যায়। তাছাড়া জুমু'আর সালাতেরখুৎবায় অনেক নসীহত ও উপকারীতা রয়েছে। অনুরূপভাবে জুমু'আরখুৎবায় রয়েছে আল্লাহর যিকির ও সাধারণ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে নসীহত।

জুমু'আর সালাত আদায়ের পদ্ধতি:

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে জুমু'আর সালাত আদায় করা হবে:

---

[1] মুসনাদ শাফে'য়ী,

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে (যোহরের সালাতের ওয়াক্ত হলেই) ইমাম জুমু‘আর সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মিম্বরে আরোহণ করবেন। লোকদেরকে সালাম দিয়ে মিম্বরে বসলে মুয়াজ্জিন যোহরের আযানের মতো আযান দিবেন। আযান শেষে ইমাম দাঁড়িয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে খুৎবা পেশ করবেন। আল্লাহর প্রশংসা ও তার বান্দা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ ও সালাম পেশ করবেন। অতঃপর মানুষকে নসীহত করবেন। নসীহতের সময় কণ্ঠস্বর উঁচু করবেন। নসীহতে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশসমূহ পালন ও নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবেন। ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ দিবেন ও মন্দ কাজের খারাপ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করবেন। আল্লাহর পুরস্কারের ওয়াদা ও আযাবের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এরপরে হালকা একটু বসবেন। আবার দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুৎবা শুরু করবেন। এতে শুরুতে আল্লাহর গুণাগুণ বর্ণনা করবেন। পূর্বের মতোই উচ্চস্বরে খুৎবা দিবেন, যেমনিভাবে সেনাপতি তার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশনা দেন। এ খুৎবা নাতিদীর্ঘ দিয়ে মিম্বর থেকে নামবেন। তখন মুয়াজ্জিন সালাতের ইকামত দিবেন। ইমাম মুসল্লীদেরকে নিয়ে উচ্চস্বরের কিরাতে দু রাকা‘আত সালাত আদায় করবেন। প্রথম রাকা‘আতে সূরা ফাতিহা পড়ে সূরা আল-আ‘লা ও দ্বিতীয় রাকা‘আতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা আল-গাশিয়াহ বা প্রথম রাকা‘আতে সূরা আল-ফাতিহার পরে সূরা আল-জুমু‘আ ও দ্বিতীয় রাকা‘আতে সূরা আল-ফাতিহার পরে সূরা আল-মুনাফিকুন পড়া উত্তম। অন্য সূরা পড়লেও হবে।

জুমু‘আর সালাতের আগে ও পরের নফলসমূহ:

ইমাম মিম্বারে উঠার পূর্বে জুমু‘আর সালাতের আগে কিছু নফল সালাত আদায় করা সুন্নত। তবে ইমাম মিম্বারে উঠার পরে ‘তাহিয়্যাতুল মসজিদ’ ব্যতীত অন্য কোনো সালাত আদায় করা বৈধ নয়। ইমাম খুৎবা দেওয়ার সময়ও সংক্ষেপে ও নিরবে দু রাকা‘আত ‘তাহিয়্যাতুল মাসজিদ’ পড়ে দ্রুত বসে পড়বে। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদিকে জুমু‘আর সালাতের পরে চার রাকা‘আত বা দু রাকা‘আত সালাত আদায় করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ জুমু‘আর পর সালাত আদায় করতে চায় সে যেন চার রাকা‘আত আদায় করে”।[1]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল সালাতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর পর তিনি কোনো সালাত আদায় করতেন না। তবে বাড়িতে ফিরে দুই রাকা‘আত সালাত আদায় করতেন”।[2]

এ হাদীসদ্বয়ের ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ বলেছেন, কেউ জুমু‘আর সালাতের পরে মসজিদে নফল পড়লে চার রাকা‘আত আর বাড়িতে গিয়ে পড়লে দু রাকা‘আত সালাত আদায় করবে।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আগে পরের সুন্নতসমূহ:

মুসলিমের সাওয়াব বৃদ্ধি ও উঁচু মর্যাদার জন্য আল্লাহ নফল সালাত দিয়েছেন। এছাড়াও ফরয সালাতের ভুলত্রুটি ও অপূর্ণতার পরিপূর্ণতা স্বরূপ এ নফল সালাতসমূহ শরী‘আতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় সালাতে রয়েছে অনেক মর্যাদা ও ফযীলত। রাবী‘আ ইবন কা‘ব আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৮১।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৮২।

«كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»

"আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত কাটিয়েছিলাম। আমি তাঁর অযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন, কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এ ছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদাহ করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো"।[1]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»

"কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের। যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয়, তবে সে হবে কল্যাণপ্রাপ্ত ও সফলকাম। আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয়, তবে সে হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। ফরযের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি দেখা যায়, তবে মহান রব বলবেন: লক্ষ্য কর, আমার বান্দার কোনো নফল আমল আছে কি? তা দিয়ে তার ফরযের যতটুকু ত্রুটি আছে তা পূরণ করে দাও। পরে এ অনুসারেই হবে অন্যান্য সব আমলের অবস্থা"।[2]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৯।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ৪১৩; তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসকে হাসান গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৬৪।

নফল সালাতের প্রকারভেদ:

নফল সালাত প্রথমত দু প্রকার: সাধারণ নফল সালাত ও নির্দিষ্ট শর্তের নফল সালাত। সাধারণ নফল সালাত আদায়ে নিয়ত করা জরুরি। নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে নফল সালাতসমূহ আবার কয়েক প্রকার। তন্মধ্যে যেসব নফল সালাত ফরয সালাতের সাথে আদায় করতে হয় তাকে 'সুনান রাতিবাহ' বা ফরয সালাতের সাথে আদায়কৃত নফল সালাত বলা হয়। এগুলো হলো: ফজর, যোহর, মাগরিব ও 'ইশার সুন্নতসমূহ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ফরয সালাতের সাথে আদায়কৃত নফল সালাতের ফযীলত:

উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন,

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

"যে কোনো মুসলিম বান্দা আল্লাহর জন্য দিনেরাতে ফরয সালাত ব্যতীত বারো রাকা'আত নফল সালাত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন"।[1]

সুন্নতে রাতেবা বা ফরয সালাতের আগে পিছের নফলসমূহের ফযীলত:

১- উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

«مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ»

"যে ব্যক্তি দিনে রাতে বার রাকা'আত (সুন্নাত/নফল) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে; যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত,

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২৮।

এরপর দু’ রাকা‘আত, মাগরিবের পর দু’ রাকা‘আত, ‘ইশার পর দু’ রাকা‘আত, ফজরের পূর্বে দু’ রাকা‘আত”।[1]

২- আবদুল্লাহ্ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ»

“আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যোহরের আগে দু’ রাকা‘আত, যোহরের পরে দু’ রাকা‘আত, জুমু‘আর পরে দু’ রাকা‘আত, মাগরিবের পরে দু’রাকা‘আত এবং ‘ইশার ‘ইশার পরে দু’ রাকা‘আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করেছি”।[2]

আরো কিছু নফল সালাত: এছাড়াও কিছু নফল সালাত আছে যা সুন্নতে রাতেবা নয়, তবে ফরয সালাতের আগে পরে পড়ার ব্যাপারে সে সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

১- আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»

“প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। তৃতীয়বার বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার জন্য”।[3]

২- উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৪১৫, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিমে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২৮।

[2] বুখারী, তা‘লীক, (২-৫২)। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২৯। তিরমিযী, হাদীস নং ৪৩৩, ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৩৮।

«مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»

“যে ব্যক্তি নিয়মিত যোহরের পূর্বে চার রাকা‘আত এবং এরপর চার রাকা‘আত সুন্নত সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিবেন”।[1]

৩- ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا»

“আল্লাহ তা‘আলা সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) আদায় করবে”।[2]

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৪২৮। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ১২৬৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ৪৩০। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ১২৭১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও এর আগে পরের সুন্নতসমূহের তালিকা:

সালাতের ওয়াক্ত	ফরযের আগের সুন্নত	ফরয সালাত	ফরযের পরের সুন্নত
ফজর	২	২	-
যোহর	২+২	৪	২
আসর	-	৪	-
মাগরিব	-	৩	২
ইশা	-	৪	২

বিতর সালাত

বিতরের সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। মুসলিমের কোনো অবস্থাতেই এ সালাত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। মূলত ‘ইশার ফরযের পরে রাতের বেলায় সব সুন্নত ও নফল শেষে এক রাকা‘আত সালাত আদায় করাকে বিতর বলে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

“রাতের সালাত দু’ দু’ (রাকা‘আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ভোর হওয়ার আশঙ্কা করে, তবে সে যেন এক রাকা‘আত সালাত আদায় করে নেয়; যার তার সকল সালাতকে বিতর বা বেজোড় করে নিবে।”।[1]

বিতর সালাতের পূর্বে করণীয় সুন্নত:

বিতর সালাতের পূর্বে দু রাকা‘আত করে দুই থেকে বারো রাকা‘আত পর্যন্ত সালাত আদায় করা সুন্নত। অতঃপর বিতরের এক রাকা‘আত সালাত আদায় করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করেছেন।

«الْوَتْرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَتِسْعٍ، وَسَبْعٍ، وَخَمْسٍ، وَثَلَاثٍ، وَوَاحِدَةٍ»

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৯০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৯।

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন ও এক রাকা‘আত বিতর আদায় করেছেন”।[1]

ইসহাক ইবন ইবরাহীম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাকা‘আত বিতর আদায় করতেন ”...... এ কথাটির মর্ম হলো তিনি সালাতুল লাইল তাহাজ্জুদসহ তের রাকা‘আত বিতর আদায় করতেন। এখানে সালাতুল লাইলকে বিতরের সাথে সম্পর্কিত করে ফেলা হয়েছে। এ বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[2]

এ তেরো রাকা‘আত সালাত দু’ দু’ রাকা‘আত করে আদায় করা যায়। অর্থাৎ দু রাকা‘আত শেষে সালাম ফিরাবে। অতঃপর এক রাকা‘আত সালাত আদায় করে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। অথবা সব রাকা‘আত একত্রে আদায় করাও জায়েয। অর্থাৎ শেষের এক রাকা‘আত বাদে বাকী সব রাকা‘আত একত্রে পড়ে তাশাহহুদ পড়বে, অতঃপর বাকী রাকা‘আত পড়তে দাঁড়াবে। সে রাকা‘আত পড়ে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। অথবা সব রাকা‘আত একত্রে পড়ে শেষে একসাথে সালাম ফিরানোও জায়েয। সব সুরতই জায়েয ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। তবে উত্তম হলো প্রতি দু রাকা‘আত শেষে সালাম ফিরানো। অথবা তাড়াহুড়া বা বার্ধক্যজনিত কোনো কারণে দু রাকা‘আত করে পড়ে শেষেও সালাম ফিরানো যায়।

বিতর সালাতের সময়:

‘ইশার সালাতের সময় থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত বিতর সালাতের সময়। কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হতে সক্ষম হলে ও সালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে রাতের শেষভাগ প্রথমভাগের চেয়ে উত্তম।

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৪৫৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] তিরমিযী, (২/৩২০)।

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

১-অসুস্থ ব্যক্তিকে যথাযম্ভব দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে। দাঁড়াতে সক্ষম না হলে দেওয়াল বা খুঁটি বা লাঠির সাথে হেলান দিয়ে বা ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

২-একেবারেই দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে সালাত আদায় করবে। দাঁড়ানো ও রুকুর স্থানে চারজানু হয়ে বসা আর সাজদাহর সময় মুফতারিশ তথা বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা ও ডান পা খাড়া করে রাখা উত্তম।

৩- বসে সালাত আদায় করতে সক্ষম না হলে কিবলামুখী হয়ে কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে। ডান কাতে সালাত আদায় করা বাম কাতের চেয়ে উত্তম। আর যদি কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তবে যেদিকে সম্ভব সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। তাকে পুনরায় এ সালাত আদায় করতে হবে না।

৪-কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম না হলে চিৎ হয়ে পা কিবলামুখী করে সালাত আদায় করবে। মাথা কিবলামুখী করতে উঁচু করা উত্তম। পা কিবলামুখী করতে সক্ষম না হলে যেভাবে সম্ভব সেভাবে আদায় করবে। তাকে পুনরায় এ সালাত আদায় করতে হবে না।

৫- অসুস্থ ব্যক্তিকে রুকু ও সাজদাহ করতে হবে। রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম না হলে মাথার ইশারায় করবে। রুকুর চেয়ে সাজদাহ একটু বেশি হেলে পড়বে। শুধু রুকু করতে সক্ষম হলে ও সাজদাহ করতে অক্ষম হলে রুকুর সময় রুকু করবে আর সাজদাহর সময় ইশারা করবে। আর যদি সাজদাহ করতে সক্ষম হয়; কিন্তু রুকু করতে অক্ষম তখন সাজদাহর সময় সাজদাহ দিবে আর রুকুর সময় ইশারা করবে।

৬- রুকু সাজদায় মাথা দ্বারা ইশারা দিতে অক্ষম হলে চোখের পাতা দিয়ে ইশারা দিবে। অর্থাৎ রুকুতে চোখ অল্প বন্ধ করবে আর সাজদায় বেশি পরিমাণ বন্ধ করবে। অন্যদিকে আঙ্গুলের দ্বারা যেসব অসুস্থ ব্যক্তি ইশারা দিয়ে থাকেন

তা আসলে সহীহ নয়। কুরআন, সুন্নাহ বা আহলে ইলমের থেকে এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

৭- মাথা দ্বারা ইশারা বা চোখের দ্বারাও যদি ইশারা দিতে না পারে তবে মনে মনে সালাত আদায় করবে। অর্থাৎ রুকু, সাজদাহ, দাঁড়ানো, বসা ও অন্যান্য রুকনের নিয়ত মনে মনে করবে ও ক্রমান্বয়ে সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এভাবে করবে ও সালাত শেষ করবে।

৮- প্রত্যেক অসুস্থ মুসল্লির উচিত যথাযম্ভব ওয়াক্ত মতো সালাত আদায় করা। সময় শেষ করে সালাত আদায় করা জায়েয নেই। যদি অযু বা তায়াম্মুম করতে কষ্টকর হয় তবে মুসাফিরের ন্যায় দু ওয়াক্তের সালাত একত্রে করে পড়া জায়েয।

৯- যদি সব ওয়াক্তের সালাত ওয়াক্ত মতো আদায় করা তার জন্য বেশি কষ্টকর হয় তবে 'জমা' বাইনাস সালাতাইন' বা যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আগে বা পরে পড়া জায়েয। ইচ্ছা করলে যোহরের সময় যোহর ও আসর একত্রে বা আসরের সময় যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিবের সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে বা ইশার সময় ইশা ও মাগরিব একত্রে পড়া জায়েয। অন্যদিকে ফজরের সালাতে কোনো জমা বা একত্রিকরণ নেই। কেননা ফজরের সালাতের সময় অন্যান্য সালাতের সময় থেকে আলাদা। এর আগে পরে কোনো সালাত নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨﴾ [الاسراء: ٧٨]

"সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম কর এবং ফজরের কুরআন।[1] নিশ্চয় ফজরের কুরআন(ফিরিশতাদের) উপস্থিতির সময়"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭৮]

---

[1] 'ফজরের কুরআন' দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের সালাত।

তৃতীয় রুকন
যাকাত

যাকাতের সংজ্ঞা:

শাব্দিক অর্থে যাকাত হলো পবিত্র হওয়া, মর্যাদা পাওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, বর্ধিত হওয়া ও বরকতময় হওয়া ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে: নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফরয সম্পদ যাকাতের নির্ধারিত হকদারকে প্রদান করাকে যাকাত বলে।

যাকাতের হুকুম:

নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে নিসাব পরিমাণ সম্পদের যাকাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। এটি ইসলামের তৃতীয় রুকন। কুরআনে সালাতের পাশাপাশি যাকাতের কথা ৮২ স্থানে উল্লেখ হয়েছে। কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা যাকাত ফরয হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

“তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ কর। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ ١١٠﴾ [البقرة: ١١٠]

“আর তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১১০]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য দান, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় অসিয়ত করেছেন, তিনি বলেছেন,

«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ»

“তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, দিনে ও রাতে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তারা এ কথাটি মেনে নিলে, সাবধান! যাকাত হিসেবে তুমি তাদের থেকে বাছাই করে উত্তমগুলো নিবে না। আর মযলুমের (বদ) দো‘আ থেকে সাবধান! কেননা আল্লাহর ও মজলুমের দো‘আর মধ্যে কোনো অন্তরায় নেই”।[2]**যাকাত অস্বীকারকারীর হুকুম:**

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯।

কেউ স্বেচ্ছায় যাকাত ফরয হওয়া অস্বীকার করলে সে কাফির ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং তাকে কুফরীর কারণে হত্যা করা হবে। আর কেউ যাকাত ফরয হওয়াকে স্বীকার করে; কিন্তু কৃপণতার কারণে যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে সে গুনাহগার হবে; তবে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাবে না। তার থেকে জোর করে যাকাত আদায় করা হবে। যদি এর জন্য তার সাথে যুদ্ধ করার দরকার হয় তবে যুদ্ধও করা হবে; যতক্ষণ না সে আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করবে এবং যাকাত আদায় করবে। এ কথার দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ ١١﴾ [التوبة: ١١]

“অতএব, যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: আয়াত: ১১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

“আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত”।[1]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০।

ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে বলেছেন,

«وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا»

"আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি মেষশাবক যাকাত দিতেও অস্বীকার করে, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তারা দিতো, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো"।[1]

যাকাত ফরয হওয়ার হিকমতসমূহ:

ইসলামী শরী'আত সুউঁচ্চ ও সুমহান কিছু হিকমতের কারণে যাকাত ফরয করেছে। নিম্নে কিছু হিকমত আলোচনা করা হলো:

১- ব্যক্তির সম্পদের পবিত্রকরণ, বৃদ্ধি, আল্লাহর আদেশ মান্য করা ও তার আদেশকে সম্মান প্রদর্শনের বরকতে বালা মুসীবত থেকে হিফাযত জন্য আল্লাহ যাকাত ফরয করেছেন।

২- কৃপণতা, লোভ-লালসার ব্যধি থেকে মানুষের আত্মিক পবিত্রতা অর্জন।

৩- গরীব-দুঃখী মানুষের দুঃখ কষ্ট ভাগাভাগি করে সমবেদনা জ্ঞাপন, অভাবী, দুর্ভিক্ষ ও বঞ্চিত মানুষের অভাব পূরণ ও অধিকার প্রদান।

৪- ঈমান ও ইসলামের প্রতি বিচ্ছিন্ন অন্তরসমূহ একত্রিকরণ ও সন্দেহ-সংশয় ও দুর্বল ঈমান থেকে দৃঢ়, অনড় পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী ঈমানে পরিণত করা।

৫- সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা; যার ওপর ভিত্তি করবে মুসলিম উম্মাহর জীবন ও সৌভাগ্য।

যাকাত আদায়ে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান:

কুরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে যাকাত আদায়ে অনেক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যাকাত আদায়কারীর অপরিসীম সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০।

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালোকাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١﴾ [المؤمنون: ١، ١١]

"অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত। আর যারা অনর্থক কথা-কর্ম থেকে বিমুখ। আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া। নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান। আর যারা নিজেদের সালাতসমূহ হিফাযত করে। তারাই হবে ওয়ারিস। যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১-১১]

আবু আইউব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ»

“তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ»

“যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। যে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করে এবং এ বিশ্বাস করে যে, তিনি ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, আর সন্তুষ্টচিত্তে তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে”।[2]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»

“তিনটি বিষয়ে আমি কসম করছি এবং সেগুলোর বিষয়ে তোমাদের বলছি। তোমরা এগুলোর সংরক্ষণ করবে। অতঃপর তিনি বললেন, “দান-সাদাকার কারণে কোনো বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। কোনো বান্দা যদি কোনো বিষয়ে মযলুম হয় আর তাতে সে সবর (ধৈর্য) অবলম্বন করে তবে এতে আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তার ইজ্জত (সম্মান) বাড়িয়ে দেন। কোনো বান্দা যখন

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৮২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ‘য়ীফ বলেছেন।

যাচঞ্ঞার দরজা খুলে তখন আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তার অভাবের দরজাও খুলে দেন”।[1]

যাকাত আদায় করতে অস্বীকারকারীর ভয়াবহতা ও ভীতিপ্রদর্শন:

যারা যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করে বা গড়িমসি করে তাদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এ সব লোক আখিরাতে বড় ক্ষতিগ্রস্ত ও যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাবে পতিত হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]

“এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জিভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক ‘আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) এটি তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪-৩৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ [ال عمران: ١٨٠]

“আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ২৩২৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮০]

আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ، فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»

“একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি কা‘বা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, কা‘বা গৃহের মালিকের শপথ, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এরপর আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম; কিন্তু বিলম্ব না করে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো অধিক সম্পদের মালিকরা। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা এদিক ওদিকে, ডানে, বামে, সন্মুখে, পাচাতে ব্যয় করেছে। তবে এদের সংখ্যা অনেক কম। উট, গরু ও ছাগলের মালিকেরা এগুলোর যাকাত আদায় না করলে কিয়ামতের দিন সেগুলোকে অনেক বড় ও তর-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট আসবে এবং তাকে ওদের শিং দ্বারা আঘাত করবে ও খুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পদদলিত করে যখনই সর্বশেষটি চলে যাবে, তৎক্ষণাৎ প্রথমটি পূনরায় ফিরে আসবে এবং তা চলতে থাকবে লোকদের ফয়সালা হওয়ার আগ পর্যন্ত”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৯০।

«مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: ﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ﴾ [آل عمران: ١٨٠]

“যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করে নি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু’পাশ কমড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন, “আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮০][1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ، وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

“সোনা-রুপা সঞ্চয়কারী ব্যক্তি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর এগুলোকে পাতের ন্যায় বানিয়ে এর দ্বারা তার পার্শ্ব এবং ললাটে দাগ দেওয়া হবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করা পর্যন্ত, এমন দিনে যে দিনের পরিমাণ হবে

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৩।

পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর দেখানো হবে তাকে তার পথ জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ»

“হে মুহাজিরগণ! যখন তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায় নি। যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের ওপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত ও তাদের ক্ষমতাশীনের পক্ষ থেকে অত্যাচার। যখন তারা যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭।

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন”।[1]

কাদের ওপর যাকাত ফরয?

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ যাদের মধ্যে পূর্ণ হবে তাদের ওপর যাকাত ফরয:

১- ইসলাম।

২- স্বাধীন।

৩- নিসাব পরিমাণ সম্পদ হওয়া এবং তা নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চলাচল ও পেশার যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অতিরিক্ত হওয়া।

৪- উক্ত নিসাব পরিমাণ মালের এক বছর অতিক্রম হওয়া। তবে খাদ্য শস্য ও ফলমূলে এক বছর অতিক্রম হওয়া শর্ত নয়। কেননা তা প্রতিবার ক্ষেত থেকে তোলার সময় এর যাকাত আদায় করতে হয়। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ١٤١﴾ [الانعام: ١٤١]

“এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৪১]

৫ -যাকাতের সম্পদ পুরোপুরি বা আংশিক ঋণমুক্ত হওয়া এবং তাতে অন্যের দাবী না থাকা।

যেসব জিনিসের ওপর যাকাত ফরয:

১- সোনারুপা:

নগদ অর্থ তথা সোনা রুপা এবং যেসব জিনিস সোনা রুপার স্থলাভিষিক্ত যেমন ব্যবসায়িক সম্পদ, খনিজ সম্পদ, গুপ্তধন বা যেসব জিনিস এসবের স্থলাভিষিক্ত যেমন, কাগজের টাকা-পয়সা ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০১৯। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৮৬২৩। ইমাম হাকিম রহ. হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছেন; তবে বুখারী ও মুসলিমে নেই।

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]

“আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) এটি তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪-৩৫]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

“পাঁচ উকিয়া (এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম পরিমাণ, ৫ উকিয়া x ৪০ = ২০০ দিরহাম সমান) পরিমাণের কম সম্পদের ওপর যাকাত নেই”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»

“চতুস্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে (গুপ্তধনে) এক-পঞ্চমাংশ ফরয”।[2]

২- চতুষ্পদ প্রাণির যাকাত:

চতুষ্পদ প্রাণি বলতে উট, গরু ও ছাগল ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৯।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১০।

«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»

"উট, গরু ও ছাগলের মালিকেরা এগুলোর যাকাত আদায় না করলে কিয়ামতের দিন সেগুলোকে অনেক বড় ও তর-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট আসবে এবং তাকে ওদের শিং দ্বারা আঘাত করবে ও খুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পদদলিত করে যখনই সর্বশেষটি চলে যাবে, তৎক্ষণাৎ প্রথমটি পূনরায় ফিরে আসবে এবং তা চলতে থাকবে লোকদের ফয়সালা হওয়ার আগ পর্যন্ত"।[1]

৩- ফল ও খাদ্যশস্য:

খাদ্যশস্য বলতে সে সব খাদ্য বুঝায় যা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। যেমন: যব, গম, শিমের বিচি, ডাল, ভুট্টা ইত্যাদি। আর ফল বলতে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায় এমন ফল। যেমন: খেজুর, জাইতুন (জলপাই), কিসমিস ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ٢٦٧﴾ [البقرة: ٢٦٧]

"হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ١٤١﴾ [الانعام: ١٤١]

"এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৪১]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৯০।

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»

“যা আকাশ হতে বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি দ্বারা উৎপন্ন অথবা যা সেচ ব্যতীতই উৎপন্ন তাতে ‘উশর তথা ১০% এবং যা নিজেদের শ্রম ব্যয় করে সেচ দেওয়া হয়েছে তাতে ‘নিসফ উশর’ তথা ৫% যাকাত দিতে হবে”।[1]

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»

“পাঁচ ওসাক) এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর যাকাত নেই”।[2]**যেসব মালের যাকাত নেই:**

১- ফলমূল ও শাকসবজি: শরী‘আতে এসব মালের যাকাত সাব্যস্ত নেই। তবে এর থেকে কিছু গরীব মিসকীনকে দান করা মুস্তাহাব। কেননা এসব মালের যাকাত কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে সাধারণভাবে শামিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ٢٦٧﴾ [البقرة: ٢٦٧]

“হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৭]

২- দাস-দাসী, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার যাকাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ»

“মুসলিমের ওপর তার ঘোড়া ও গোলামের কোনো যাকাত নেই”।[3]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৮৩।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৯।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৬৩।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খচ্চর ও গাধার যাকাত গ্রহণ করেছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

৩- নিসাব পরিমাণ পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয নয়। তবে সম্পদের মালিক ইচ্ছা করলে দান করতে পারেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ»

“পাঁচ উকিয়া (এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম পরিমাণ, ৫ উকিয়া x ৪০ = ২০০ দিরহাম সমান) পরিমাণের কম সম্পদের ওপর যাকাত নেই; পাঁচ ওসাক (এক ওসাক ৬০ সা‘-এর সমান, ৫ ওসাক x ৬০= ৩০০ সা‘।) এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কমের ওপর যাকাত নেই”।[1]

৪- ব্যবসায়িক পণ্য যা সংরক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে; ব্যবসার জন্য নয়, এতে যাকাত নেই। যেমন: বিছানাপত্র, ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা ও গাড়ি।

৫- ব্যবহৃত মূল্যবান অলংকার যেমন, পান্না, মণিমুক্তা, নীলকান্তমণি ও অন্যান্য গহনাদির কোনো যাকাত নেই। তবে এগুলো যদি ব্যবসার জন্য হয় তবে এতে ব্যবসার মালের মতো যাকাত দিতে হবে।

৬- শুধু সৌন্দর্য্যের ব্যবহৃত মহিলাদের অলংকারে যাকাত নেই। কিন্তু সৌন্দর্য্যের সাথে যদি প্রয়োজনের সময় কাজে লাগবে বলে গচ্ছিত করে রাখার হয় তবে এতে গচ্ছিত সম্পদের মতো যাকাত আসবে। তা সত্ত্বেও অধিক তাকওয়া অবম্বলনে নারীর অলংকারে সর্বাবস্থায় যাকাত আদায় করা উত্তম। কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৯।

«دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟»، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমার ঘরে আসলেন। তখন তিনি আমার হাতে রুপার তৈরি আংটি দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী হে আয়েশা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার জন্য আমি নিজেকে সজ্জিত করতে এটি তৈরি করেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এর যাকাত আদায় করো? আমি বললাম, না। অথবা আল্লাহ যা চাইলেন তা বললাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট”।[1]

যাকাতের নিসাব পূর্ণ হওয়ার শর্তাবলী ও ফরযকৃত নিসাব: ক- সোনা-রুপা ও অনুরূপ সম্পদের যাকাত:

১- সোনার যাকাত:

সোনার নিসাব হলো বিশ দিনার পূর্ণ হলে (২০ দিনার = ৮৫ গ্রাম) এবং তা এক বছর অতিক্রান্ত করলে এতে যাকাত ফরয হবে। আর এর যাকাতের পরিমাণ হলো রুব‘উল ‘উশর বা ২.৫%। অর্থাৎ প্রতি বিশ দিনারে অর্ধ দিনার করে হিসেব করতে হবে। এর বেশি কম হলে ২.৫% এর আনুপাতিক হারে হিসেব করতে হবে।

২- রুপার যাকাত:

রুপার যাকাতের শর্ত হলো নিসাব পরিমাণ হওয়া। এর পরিমাণ হলো ৫ আউন্স (আওকিয়া) বা (৫৯৫ গ্রাম)। আবার এক আউন্স= ৪০ দিরহাম। সুতরাং ৪০×৫=২০০ দিরহাম। এ সম্পদ পূর্ণ একবছর অতিক্রান্ত হতে হবে। এতে

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

যাকাতের পরিমাণ হলো ২.৫%। অতএব, প্রতি ২০০ দিরহামে ৫ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। এর বেশি হলে একই নিয়মে হিসেব করতে হবে।

৩- সোনা-রুপার মিশ্রণ:

কেউ নিসাবের কম পরিমাণ সোনা ও নিসাবের কম পরিমাণ রুপার মালিক হলে সোনা-রুপা উভয়টি একত্রিত করবে। এতে যদি নিসাব পূর্ণ হয় তবে তাতে সোনার হিসেবে সোনার ও রুপার হিসেবে রুপার অংশের যাকাত দিবে। তাছাড়া যে কোনো একটির হিসেবে যাকাত দিলেও যথেষ্ট হবে। যেমন কারো ওপর এক দিনার ফরয হলে দশ দিরহাম দিয়ে বা দশ দিরহাম ফরয হলে এক দিনার দিয়ে যাকাত আদায় করলেও জায়েয হবে।

৪- কাগজের নোটের যাকাত:

কারো কাছে সোনা বা রুপার নিসাবের পরিমাণ কাগজের নোটের অর্থ থাকলে এবং তা একবছর অতিবাহিত হলে তাতে ২.৫% হিসেবে যাকাত ফরয হবে।

৫- ব্যবসায়িক সম্পদ:

কারো কাছে সোনা বা রুপার নিসাবের পরিমাণ ব্যবসায়িক সম্পদ থাকলে এবং তা একবছর অতিবাহিত হলে বছর শেষে তাতে ২.৫% হিসেবে যাকাত ফরয হবে। ব্যবসায়ী সোনা বা রুপা যে কোনো একটির হিসেব করে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে।

৬- ঋণের সম্পদের যাকাত:

যাকাতদাতার ঋণের অর্থ যদি অন্যের কাছে থাকে এবং সে যখন ইচ্ছা তা আদায় করতে সক্ষম হয় তবে উক্ত সম্পদ তার নগদ অর্থ বা ব্যবসায়িক সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করবে; যদি তাতে একবছর পূর্ণ হয়। আর যদি যাকাতদাতার কাছে ঋণের অর্থ ব্যতীত অন্য সম্পদ না থাকে এবং ঋণের সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয়, আর উক্ত অর্থ যে কোনো সময় আদায় করতে সক্ষম হয় তবে তা থেকে যাকাত দিয়ে দিবে। অন্যদিকে যাকাতদাতার ঋণের অর্থ নিঃস্ব-দরিদ্র বা ঋণ অস্বীকারকারীর কাছে থাকে, সহজে উক্ত অর্থ

আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে যখন উক্ত অর্থ আদায় করতে সক্ষম হবে তখন শুধু সে বছরের যাকাত আদায় করবে। বিগত বছরের যাকাত আদায় করতে হবে না। যদিও অনেক বছর অতিবাহিত হয়।

৭- গুপ্তধনের যাকাত:

রিকায শব্দটির অর্থ গুপ্তধন, লুকায়িত সম্পদ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرۡنٍ هَلۡ تُحِسُّ مِنۡهُم مِّنۡ أَحَدٍ أَوۡ تَسۡمَعُ لَهُمۡ رِكۡزَۢا ٩٨﴾ [مريم: ٩٨]

"আর তাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে আমি ধ্বংস করেছি! তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও, কিংবা শুনতে পাও তাদের কোনো ক্ষীণ আওয়াজ?" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৯৮]

অর্থাৎ গোপন আওয়াজ। এখানে গুপ্তধন বলতে জাহেলী যুগে জমিনের নিচে পুঁতে রাখা ধন সম্পদ। কেউ তার জমিনে বা ঘরে এ সম্পদ পেলে গরিব, মিসকীন ও কল্যাণকর কাজে এক পঞ্চমাংশ (২০%) হারে যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»

"চতুস্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে (গুপ্তধনে) এক-পঞ্চমাংশ (২০% হারে) ফরয"।[1]

৮- খনিজ সম্পদের যাকাত:

খনিজ সম্পদটি যদি সোনা বা রুপা হয় এবং নিসাব পরিমাণ হয় তবে তা উত্তোলনের সময়ই সোনা রুপার যাকাতের পরিমাণ অনুযায়ী (২.৫%) যাকাত আদায় করবে। এতে একবছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়; বরং ফসলের যাকাতের ন্যায় যখনই উত্তোলন করা হবে তখনই যাকাত দিবে। এতে কি ২.৫% নাকি ২০% হারে যাকাত আদায় করবে সে ব্যাপারে আলেমদের

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৯৯। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১০।

মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ এতে গুপ্তধনের ন্যায় ২০% হারে যাকাত আদায় করার মত দিয়েছেন। আর যারা ২.৫% হারে যাকাত আদায় করার মত দিয়েছেন তারা সোনা রুপার যাকাত ফরয হওয়ার হাদীসের সাধারণ অর্থের দিকে কিয়াস করে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করার মত ব্যক্ত করেছেন। এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী থেকে নেওয়া হয়েছে,

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

“পাঁচ উকিয়া (এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম পরিমাণ, ৫ উকিয়া x ৪০=২০০ দিরহাম সমান) পরিমাণের কম সম্পদের ওপর যাকাত নেই”।[1]

এ হাদীসে খনিজ ও অনান্য সব সম্পদকে শামিল করেছে। তবে বিষয়টিতে প্রশস্তি রয়েছে। (অর্থাৎ যে কোনো মতই গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে)

আর খনিজ সম্পদটি যদি সোনা রুপা না হয়ে অন্য কিছু হয়, যেমন: লোহা, পিতল, তেল, জ্বালানি বা অন্য কিছু ততে তাতে ২.৫% হারে যাকাত দেওয়া মুস্তাহাব। কেননা এ ব্যাপারে হাদীসে সরাসরি কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। আর এগুলো সোনা বা রুপাও নয় যে এর ওপর যাকাত ফরয বলা যাবে।

৯- মালে মুসতাফাদ বা অতিরিক্ত আয়ের যাকাত:

ব্যবসা থেকে অর্জিত লভ্যাংশ বা পশুর প্রজন্ম থেকে আগত বাচ্চা মূলধনের সাথে একত্রিত করে যাকাত আদায় করতে হবে এবং বছর অতিক্রান্ত হওয়ার অপেক্ষা করতে হবে না। সুতরাং যার কাছে ব্যবসায়ী সম্পদ বা জন্তু নিসাব পরিমাণ থাকবে, তারপর বছরের মাঝে ব্যবসায় বর্ধিত হয়ে আরও সম্পদ যোগ হবে বা জন্তুর বাচ্চা হয়ে বৃদ্ধি পাবে, তখন তার উপর কর্তব্য হবে যখন মূলধনের যাকাত দিবে তখন অতিরিক্ত অর্জিত সম্পদ মূলধনের সাথে মিলিয়ে যাকাত দেওয়া। (অর্থাৎ অর্জিত প্রত্যেক সম্পদের জন্য আলাদা বছর পুরো করা লাগবে না)

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৯।

আর যদি মালে মুসতাফাদ বা অতিরিক্ত লাভের সম্পদ একজাতীয় না হয়, অর্থাৎ ব্যবসায়ের লভ্যাংশ বা উৎপাদিত পশুর বাচ্চা থেকে না হয়ে অন্য কোনো কিছু হয় তাহলে সে প্রত্যেক সম্পদের জন্য আলাদা নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হলে তাতে যাকাত দিবে। যেমন, হিবা বা মিরাস ইত্যাদি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে যাকাত দিতে হবে না।

খ- গবাদিপশুর যাকাত:

১- উটের যাকাত:

উটের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে:

- নিসাব পূর্ণ হলে এতে যাকাত ফরয হবে। আর উটের নিসাব হলো কমপক্ষে ৫টি বা ততোধিক উট হতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ[1] صَدَقَةٌ»

“পাঁচটি উটের কমের ওপর যাকাত নেই”।[2]

- তাছাড়া এ ৫টি উটে একবছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং
- তা সায়েমা বা প্রাকৃতিক চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণকারী হতে হবে।

উটের যাকাতের পরিমাণ:

৫-৯ টি উটের জন্য পূর্ণ একবছর হয়েছে এমন ১ টি ছাগল বা মেষ যাকাত দিতে হবে।

১০-১৪ টি উটের জন্য ২টি ছাগল বা মেষ যাকাত দিতে হবে।

১৫-১৯ টি উটের জন্য ৩টি ছাগল বা মেষ যাকাত দিতে হবে।

২০-২৪ টি উটের জন্য ৪টি ছাগল বা মেষ যাকাত দিতে হবে।

---

[1] হাদীসে উল্লিখিত ذَوْدٍ শব্দটি তিন থেকে দশটি উটের জন্য ব্যবহৃত হয়।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৯।

২৫-৩৫ টি উটের জন্য একটি বিনতে মাখাদ্ব উট বা এক বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে। যদি তা না পাওয়া যায় তবে একটি ইবন লাবূন দিলেও যথেষ্ট হবে, আর তা হচ্ছে যে পুরুষ উট দু'বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে।

৩৬-৪৫ টি উটের জন্য বিনতে লাবূন বা দু'বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

৪৬-৬০টি উটের জন্য হিক্কাহ বা তিন বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

৬১-৭৫ টি উটের জন্য জায'আহ বা চার বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

৭৬-৯০ টি উটের জন্য দু'টি বিনতে লাবূন বা দু'বছর বয়সী ২টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

৯১-১২০ টি উটের জন্য দু'টি হিক্কাহ বা তিন বছর বয়সী ২টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

১২০ এর পরে প্রতি ৪০টি উটে এক বিনতে লাবূন বা এক বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট, আর প্রতি ৫০ টি উটে এক হিক্কাহ বা তিন বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

ফায়েদা: কারো ওপর নির্দিষ্ট বয়সের উট ওয়াজিব হলে তার কাছে সে বয়সের উট না থাকলে ছোট বা বড় যাই থাকুক সেটাই যাকাত হিসেবে আদায় করবে, তবে অতিরিক্ত বিশ দিরহাম বা দু'টি মেষ ত্রুটির সম্পূরক হিসেবে দিতে হবে। তবে এক বছর বয়সী স্ত্রী উটের (বিনত মাখাদ্ব) পরিবর্তে একটি দু বছর বয়সী পুরুষ উট (ইবন লাবুন) দিলে কোনো কিছু অতিরিক্ত দান করতে হবে না।

২- গরুর যাকাত:

উটের যাকাতের ন্যায় গরুতেও যাকাত দিতে হবে, তবে শর্ত হচ্ছে:

- যাকাতের নিসাব পূর্ণ হতে হবে

- একবছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং
- তা সায়েমা বা প্রাকৃতিক চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণকারী হতে হবে।

গরুর সর্বনিম্ন নিসাব হলো ৩০ টি।

- ৩০ থেকে ৩৯ টি গরুর জন্য 'ইজল তাবী' বা এক বছর বয়সী ১টি গরু যাকাত দিতে হবে।
- ৪০-৫৯ টি গরুর জন্য মুসিন্না বা দু' বছর বয়সী ১টি গরু যাকাত দিতে হবে।

৬০-৬৯ টি গরুর জন্য দু'টি তাবী' বা একবছর বয়সী ২টি গরু যাকাত দিতে হবে।

- ৭০-৭৯ টি গরুর জন্য একটি তাবী' বা একবছর বয়সী ১টি ও একটি মুসিন্না বা দু'বছর বয়সী ১টি গরু যাকাত দিতে হবে।
- এভাবে প্রতি ৪০ টি গরুর জন্য একটি দু' বছর বয়সী ১টি গরু ও প্রতি ৩০ টির জন্য একবসর বয়সী ১টি গরু যাকাত দিতে হবে।
- ৮০টির জন্য দু' বছর বয়সী ২টি গরু যাকাত দিতে হবে।
- ৯০টির জন্য একবছর বয়সী ৩টি গরু যাকাত দিতে হবে।
- ১০০টি গরুর জন্য দু' বছর বয়সী ১টি গরু ও একবছর বয়সী ২টি গরু যাকাত দিতে হবে।

গরুর যাকাতের ব্যাপারে মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়েমেনে পাঠালেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, প্রতি ত্রিশ গরুতে এক বছর বয়সী একটি গরু ও

প্রতি চল্লিশ গরুতে দু'বছর বয়সী একটি গরু যাকাত হিসেবে যেন আমি নেই"।[1]

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮০৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৭৬। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

প্রাকৃতিক চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণকারী পশুতে যাকাতের পরিমাণ:

<table>
<tr><th colspan="3">ছাগল</th><th colspan="3">উট</th><th colspan="3">গরু</th></tr>
<tr><th colspan="2">পরিমাণ</th><th>যাকাত</th><th colspan="2">পরিমাণ</th><th>যাকাত</th><th colspan="2">পরিমাণ</th><th>যাকাত</th></tr>
<tr><td>থেকে</td><td>পর্যন্ত</td><td>যাকাত</td><td>থেকে</td><td>পর্যন্ত</td><td>যাকাত</td><td>থেকে</td><td>পর্যন্ত</td><td>যাকাত</td></tr>
<tr><td>৪০</td><td>১২০</td><td>১ টি ছাগল</td><td>৫</td><td>৯</td><td>১ টি ছাগল</td><td>৩০</td><td>৩৯</td><td>১টি তাবী‘/ তাবী‘আহ</td></tr>
<tr><td>১২১</td><td>২০০</td><td>২টি ছাগল</td><td>১০</td><td>১৪</td><td>২ টি ছাগল</td><td>৪০</td><td>৫৯</td><td>মুসিন্নাহ</td></tr>
<tr><td>২০১</td><td></td><td>৩টি ছাগল</td><td>১৫</td><td>১৯</td><td>৩ টি ছাগল</td><td>৬০</td><td></td><td>২টি তাবী‘</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">এরপরে প্রতি ১০০টির জন্য ১টি ছাগল।</td><td>২০</td><td>২৪</td><td>৪ টি ছাগল</td><td colspan="3">এরপরে প্রতি ৩০টি গরুতে ১টি তাবী‘ এবং প্রতি ৪০টি গরুতে ১টি মুসিন্নাহ যাকাত দিতে হবে।</td></tr>
<tr><td>২৫</td><td>৩৫</td><td>১টি বিনতে মাখায</td><td colspan="3" rowspan="3">* তাবী‘ বা তাবী‘আহ: ১ বছর বয়সী গরু।
* মুসিন্নাহ: ২ বছর বয়সী গরু।</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">* যাকাতে বৃদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত ও নিকৃষ্ট পশু গ্রহণ করা হবে না।
* আবার যাকাতের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট মালও নেওয়া হবে না।</td><td>৩৬</td><td>৪৫</td><td>১টি বিনতে লাবূন</td></tr>
<tr><td>৪৬</td><td>৬০</td><td>১টি হিক্কাহ</td></tr>
<tr><td>৬১</td><td>৭৫</td><td>১টি জিয‘আ</td><td colspan="3" rowspan="5">* হিক্কাহ: ৩ বছর বয়সী উটকে হিক্কাহ বলে। এটি তখন আরোহণের উপযোগী বলে একে হিক্কাহ বলে।
* জিয‘আহ: ৪ বছর বয়সী উটকে জিয‘আহ বলে।</td></tr>
<tr><td>৭৬</td><td>৯০</td><td>২টি বিনতে লাবূন</td></tr>
<tr><td>৯১</td><td>১২০</td><td>২টি হিক্কাহ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">* বিনতে মাখায: এক বছর বয়সী স্ত্রী উট। একে বিনতে মাখায বলার কারণ এর মা তখন গর্ভবতী হয়।
* বিনতে লাবূন: ২ বছর বয়সী স্ত্রী উট। একে লাবূন বলা হয় যেহেতু এর মা তখন দুগ্ধবতী হয়ে যায়।</td><td>১২১</td><td></td><td>৩টি বিনতে লাবূন</td></tr>
<tr><td colspan="3">এরপরে প্রতি ৪০টি উটে ১টি বিনতে লাবূন এবং ৫০টি উটে ১টি হিক্কাহ যাকাত দিতে হবে।</td></tr>
</table>

৩- মেষপালের যাকাত:

ছাগল ও মেষের যাকাত দিতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে:

- যাকাতের নিসাব পূর্ণ হতে হবে,
- একবছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং
- তা সায়েমা বা প্রাকৃতিক চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণকারী হতে হবে।

ছাগলের সর্বনিম্ন নিসাব হলো ৪০টি।

- ৪০-১২০ টি মেষের জন্য ১টি মেষ।
- ১২১-২০০ টি মেষের জন্য ২টি মেষ।
- ২০১-৩০০ টি মেষের জন্য ৩টি মেষ।
- ৩০০ এর অতিরিক্ত হলে প্রতি একশতে ১টি করে মেষ দিতে হবে।

মেষের যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«وَفِي الشَّاءِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ»

“ভেড়া বকরীর যাকাত হলো: চল্লিশ থেকে একশত বিশ পর্যন্ত বকরীর জন্য একটি বকরী; এর বেশি হলে দু’শত পর্যন্ত দু’টি বকরী; এর বেশি হলে তিনশত পর্যন্ত বকরীর জন্য তিনটি বকরী; তিনশতর বেশি হলে প্রতি একশত বকরীর জন্য একটি করে বকরী যাকাত আদায় করতে হবে। তারপর বকরীর পরিমাণ আবার একশত পর্যন্ত না পৌঁছালে (পুনরায়) কোনো যাকাত দিতে হবে না”।[1]

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৬২১। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসটি হাসান। আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

খাদ্যশস্য ও ফলের যাকাত:

খাদ্যশস্যে যখন দানা পরিপক্ক হয় এবং খোসাযুক্ত হয় তখন এতে যাকাত ফরয হয়। আর ফলমূল যখন পরিপক্ক হয়ে খাওয়ার উপযোগী হয় তখন এতে যাকাত ফরয হয়। প্রত্যেক ফল খাওয়ার উপযোগী হওয়া সবার কাছেই পরিচিত। যেমন, খেজুর লালচে বা হলুদ বর্ণের হলে, আঙ্গুর মিষ্টি হলে তা খাওয়ার উপযোগী।

খাদ্যশস্য ও ফলের যাকাতের দলীল হলো আল্লাহর বাণী,

﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ ١٤١﴾ [الانعام: ١٤١]

“এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৪১]

খাদ্যশস্য ও ফলের যাকাতের পরিমাণ হলো পাঁচ ওসাক। আর এক ওসাক = ৬০ সা‘। আর ১ সা‘ = ৪ মুদ্দ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»

“পাঁচ ওসাক (এক ওসাক ৬০ সা‘-এর সমান, ৫ ওসাক x ৬০= ৩০০ সা‘।) এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর যাকাত নেই”।[1]

সেটা অনুসারে ফল, কিসমিস, গম, চাল ও যবের নিসাবের পরিমাণ হবে, এক ওসাক ৬০ সা‘-এর সমান, ৫ ওসাক x ৬০= ৩০০ সা‘, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা‘ অনুযায়ী। আর এক সা‘ হচ্ছে, কোনো সাধারণ লোকের দু’ হাতের একত্রিত চার মুষ্টির পরিমাণ; যখন তার দু’হাত পূর্ণ থাকবে।

তবে খাদ্যশস্য ও ফলমূলে যাকাতের পরিমাণ ফরয হওয়ার কিছু শর্ত আছে। তা হলো, যদি বিনা খরচে প্রাকৃতিক বৃষ্টির পানিতে বা ঝর্ণার পানিতে খাদ্যশস্য

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৯।

ও ফলমূল উৎপাদিত হয় তবে তাতে ‘উশর বা এক দশমাংশ (১০%) অর্থাৎ প্রতি পাঁচ ওসাকে অর্ধ ওসাক যাকাত ফরয হবে। শ্রম নির্ভর সেচ, যেমন কূপ ইত্যাদি থেকে পানি এনে সেচ দেওয়া সাপেক্ষে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো (৫%)। এর বেশি বা কম হলে উপরোক্ত হারে হিসেব করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»

“যা আকাশ হতে বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি দ্বারা উৎপন্ন অথবা যা সেচ ব্যতীতই গাছ তার শিরার মাধ্যমে পানি আহরণ করে উৎপন্ন করে, তাতে ‘উশর তথা ১০% এবং যা নিজেদের শ্রম ব্যয় করে সেচ দেওয়া হয়েছে তাতে ‘নিসফ উশর’ তথা ৫% যাকাত দিতে হবে”।[1]**যাকাতের খাতসমূহ:**

যাকাতের খাত হলো আটটি। তা হলো:

১ – ফকীর।

২ – মিসকীন।

৩ - যাকাতে নিয়োজিত কর্মচারী।

৪ - দীনের জন্য যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য।

৫ – গোলাম আযাদ।

৬ - ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

৭ - আল্লাহ রাস্তায় দান।

৮ - মুসাফির।

এসব খাত সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: ٦٠]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৮৩।

“নিশ্চয় সদকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস 'আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]

যাকাতের এসব প্রকার নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১- ফকীর: ফকীর হলো যার নিজের ও পরিবারের অবশ্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে, যেমন খাদ্য, পানীয়, কাপড় ও বাসস্থানের অভাব থাকা। অর্থাৎ তার কাছে এসব জিনিস একেবারেই নেই বা সামান্য কিছু থাকলেও তা প্রয়োজনের অর্ধেকের কম।

২- মিসকীন: মিসকীন কখনো কখনো ফকীরের চেয়ে স্বল্প অভাবে থাকে অথবা বেশি, কিন্তু বিধানের দিক থেকে উভয়ের বিধান একই। সর্বাবস্থায় বলা যায় যে, মিসকীনের অভাব রয়েছে। যেমন এক ব্যক্তির কাছে একশ টাকা আছে, কিন্তু তার প্রয়োজন দু'শ টাকার, এমতাবস্থায় তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণ হতে বাকি যা টাকা লাগে তা যাকাত থেকে দেওয়া হবে।

৩- যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী: যারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যাকাত জমা করেন, যাকাতের সম্পদ পাহারা দেন, অভাবগ্রস্তদের মাঝে বণ্টন করেন, এ সম্পদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা নেওয়া করেন ইত্যাদি যাকাতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি যাদেরকে বাইতুল মাল থেকে বেতন নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি। তারা ধনী হলেও যাকাতের সম্পদ থেকে বেতন নিতে পারবেন।

৪ -দীনের প্রতি যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য: নিজগোত্রে সম্মান ও আনুগত্যের পাত্র এমন নেতৃবর্গ যাদেরকে অর্থদান করলে ইসলাম গ্রহণ করার অথবা মুসলিমদেরকে নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকার অথবা তাদের ঈমানে মজবুতি সৃষ্টি হওয়ার অথবা মুসলিমদের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আশা করা যায়। যে পরিমাণ সম্পদ দিলে এদের অন্তর আকৃষ্ট হবে বলে আশা

করা যায়, যাকাতের সম্পদ থেকে এদেরকে সে পরিমাণ সম্পদ দেওয়া হবে।**৫ - গোলাম আযাদ:** এ খাতের উদ্দেশ্য এমন মুসলিম যিনি দাস হয়ে রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের সম্পদ দ্বারা ক্রয় করে স্বাধীন করে দেওয়া হবে। অথবা যদি কোনো 'মুকাতাব' (যে দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য টাকা দেওয়ার ব্যাপারে মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এমন) মুসলিম দাস হিসেবে থাকে, তাকে তার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য বাকী কিস্তির অর্থ প্রদান করার জন্য যাকাতের টাকা থেকে দেওয়া যেতে পারে।

ফায়েদা: মুসলিম ও কাফিরের মধ্যকার যুদ্ধে যারা যুদ্ধবন্দি তাদেরকেই দাস বলে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ভুল ধারণা যে, কালো বর্ণের মানুষকে দাস বলা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। ইসলাম মানবজাতিকে স্বাধীন করতে অত্যন্ত তৎপর। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে আবদ্ধ করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। এজন্যই ইসলাম নানাভাবে তা বাস্তবায়ণ করার ব্যাপারে চেষ্টা চালায়, সে জন্যই দাসমুক্তিকে যাকাতের খাত নির্ধারণ করেছে, অনুরূপভাবে কাফফারা দেওয়ার জন্যও দাসমুক্তির বিধান দিয়েছে। তাছাড়াও স্বাধীন করার জন্য অনেক বেশি তাগিদ দিয়েছে।

৬ - ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি: ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বলতে বুঝায় যার জিম্মায় আল্লাহর নাফরমানী কাজ ব্যতীত অন্যভাবে নিজের জায়েয কাজে বা অন্য মানুষের মধ্যে সমঝোতা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং তাকে তার ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে।

৭ - আল্লাহ রাস্তায় দান: (আল্লাহর রাস্তা) বলতে বুঝায় এমন পথ যা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করে। অধিকাংশ আলেমরে নিকট এর দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী লোকদের বুঝানো হয়েছে। সুতরাং জিহাদে নিয়োজিত মুজাহিদ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাদের বেতন নির্ধারিত নেই তারা ধনী হোক বা গরিব হোক তাদেরকে বেতন হিসেবে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে।

৮ - **মুসাফির:** সফর অবস্থায় যে নিঃস্ব ও অর্থশূন্য হয়ে পড়েছে। এরূপ ব্যক্তিকে নিজ দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাকাত থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে, স্বদেশে সে ধনী হলেও। তবে শর্ত হলো কেউ যদি তাকে ধার হিসেবে টাকা না দেয়। যদি কেউ ধার হিসেবে টাকা দেয় তবে তার ওপর কর্তব্য হবে সে ধার গ্রহণ করা।

কিছু সতর্কীকরণ:

১- যাকাতের সম্পদ যেখানে আহরণ করা হবে সে স্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্ব যদি সফরে যে দূরত্বে কসর করতে হয় ততটুক দূরত্ব হয় বা তার বেশি হয় তবে তা স্থানান্তর করা জায়েয নয়; বরং যেখান থেকে যাকাত উত্তোলন করা হবে সে এলাকার লোকদের মধ্যেই উক্ত যাকাত বন্টন করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইয়ামেনে প্রেরণ করার সময় এ অসিয়ত করেছেন:

«فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ»

“যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে তা বণ্টন করা হবে”।[1]

তবে ফিকহবিদগণ যাকাত উত্তোলনকারী এলাকার মানুষ অভাবমুক্ত হলে বা দুর্ভিক্ষ বা মুজাহিদদের সাহায্যার্থে বা বিশেষ প্রয়োজনে এক স্থানের যাকাত অন্য স্থানের হকদারদের মধ্যে স্থানান্তর করা জায়েয বলেছেন।

২- যাকাত প্রদানের সময় উল্লিখিত আট খাতের সবগুলোকেই শামিল করতে হবে তেমন কোনো কথা নেই। তবে যদি সম্পদের পরিমাণ বেশি হয় তবে সকল খাতে বণ্টন করা উত্তম। আর যদি সম্পদ কম হয় তবে আট খাতের

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯।

যেকোনো একটিতে প্রদান করলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদিও যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক অভাবী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টির খেয়ালা রাখা জরুরী।

৩- আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের উচ্চ সম্মানের কারণে তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়েয নয়। আহলে বাইত হলো: বনী হাশিম, তারা হলেন: আলী, ‘আকীল, জা‘ফর, আব্বাস ও হারিস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম এর পরিবারবর্গ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»

“এ যাকাত হলো মানুষের ময়লা-আবর্জনা, অতএব তা মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ পরিবারের জন্য হালাল নয়”।[1]

তবে কিছু আলেম বলেছেন, নবী পরিবারের অভাব চরম পর্যায়ে পৌঁছলে এবং তাদেরকে তাদের নির্ধারিত খাতের অর্থ প্রদান করা না হলে তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়েয হবে।

৪- মুসলিম ব্যক্তির ওপর যাদের ব্যয়ভার বহন করা কর্তব্য, যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, (এবং এর ঊর্ধবর্তী ব্যক্তিরা) সন্তান, নাতি-নাতনি (এবং এর নিম্নগামী ব্যক্তিরা) এদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। এভাবে নিজের স্ত্রীকেও যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। তবে স্ত্রী তার যাকাতের অর্থ স্বামীকে দিতে পারবেন। কারণ আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন,

«يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৭২।

“হে আল্লাহর নবী! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আপনি সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অলংকার আছে। আমি তা সাদকা করব ইচ্ছা করেছি। ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মনে করেন, আমার এ সাদকায় তাঁর এবং তাঁ সন্তানদেরই হক বেশি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবন মাস‘উদ ঠিক বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তানই তোমার এ সাদকায় অধিক হকদার”।[1] যদিও এটি নফল সাদকার সাথে সংশ্লিষ্ট।

৫- কাফির, মুরতাদ, ফাসিক যেমন সালাত অনাদায়কারী ও ইসলামী শরি‘আতের উপহাসকারীকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ»

“ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে”।[2]

এখানে মুসলিম ধনী ও মুসলিম গরিব মিসকীনের কথা বলা হয়েছে, অন্যদের নয়। তবে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করতে তাদেরকে যাকাত দেওয়ার বিষয়টি তা থেকে ভিন্ন।

এমনিভাবে ধনী ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকেও যাকাত দেওয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مَرَّةٍ مُكْتَسِبٍ»

“ধনী ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাতে কোনো হিস্যা নেই”।[3]

৬- যাকাত হলো ইবাদত। সুতরাং যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার শর্ত হলো নিয়ত করা। যাকাত আদায়কারী একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সাওয়াবের

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৬২।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯।

[3] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬৩৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ২৫৯৮।

প্রত্যাশায় তা আদায় করা। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করা যে, সে তার ওপর ফরযকৃত যাকাত আদায় করছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

“প্রত্যেক কাজ নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল”।[1]

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

যাকাতুল ফিতর

রমযান মাসের সাওম ভঙ্গ করার পর ঈদুল ফিতরের কারণে যে যে যাকাত আদায় করা হয় তাকে যাকাতুল ফিতর বলে।

যাকাতুল ফিতরের হুকুম:

প্রত্যেক ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন ও দাস-দাসী মুসলিমের ওপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ»

"প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের ওপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন"।[1]

যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার হিকমত:

ইসলাম অনেক হিকমতের কারণে যাকাতুল ফিতর মানুষের ওপর ওয়াজিব করেছে। সেগুলো হলো:

১- এ সাদাকার মাধ্যমে সাওম পালনকারীর অশ্লীল কথাবার্তা ও ভুলত্রুটি থেকে পবিত্র করা হয়।

২- দরিদ্রদের প্রতি প্রশস্ততা আনা ও ঈদের দিন তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেওয়া যাতে অন্যের কাছে চাইতে না হয়। হাদীসে এসেছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৪।

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন সাওম পালনকারীকে অহেতুক ও অশ্লীল কথা থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে ও মিসকীনদের খাবার দানস্বরূপ”।[1]

কাদের ওপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব:

ঈদের দিন ও রাতে যে ব্যক্তি তার নিজের ও পরিবারের খাবারের অতিরিক্ত এক সা‘ পরিমাণ খাদ্যের মালিক হবে তার ওপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।

যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও কোন প্রকারের খাদ্য থেকে তা আদায় করা যাবে:

প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক সা‘ করে যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। আর সা‘ হচ্ছে চার মুদ্দ। আর প্রতি মুদ্দ হচ্ছ সাধারণ মধ্যম আকৃতির লোকের দু’ হাতের পূর্ণ অঞ্জলি পরিমাণ বস্তু। তা হতে হবে দেশের প্রচলিত মানব-খাদ্য থেকে, যেমন গম, যব, খেজুর, চাউল, কাউন, কিসমিস অথবা পনির। কেননা আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড় স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬০৯। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ১৪৮৮। ইমাম হাকিম রহ. বলেছেন, হাদীসটি বুখারীর শর্তে; তবে তিনি এ সনদে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন নি। ইমাম যাহাবী রহ. ও এটাকে বুখারীর শর্তে বলেছেন।

বাবদ এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম।”।[1]

কখন ওয়াজিব ও কখন আদায় করতে হয়:

ঈদুল ফিতরের রাত নেমে আসার সাথে সাথেই যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়। কারণ এটাই হচ্ছে রমযানের ইফতার করার সময়।

আর যাকাতুল ফিতর আদায় করার সময়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছে: যাকাতুল ফিতর আদায় করার জায়েয সময় রয়েছে আবার ফযিলতপূর্ণ সময় ও আদায় হওয়ার সময় রয়েছে।

তন্মধ্যে জায়েয সময় হচ্ছে: ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্ব থেকে। কারণ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ও অন্যান্য সাহাবীগণ তা করতেন।

আর আদায় হওয়া ও ফযিলতপূর্ণ সময় হচ্ছে, ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর ও ঈদের সালাতের সামান্য পূর্ব পর্যন্ত। কারণ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাকাতুল ফিতর লোকজনের ঈদের সালাত বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন”।[2]

নাফে' রহ. বলেন, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ঈদের আগের দিন বা এর দু'দিন আগে আদায় করে দিতেন। নাফে' থেকে অন্য বর্ণনার শব্দ হচ্ছে:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৫।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৪।

“ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদেরকেই দিতেন যারা তা গ্রহণ করত। আর সাহাবীগণ ঈদের এক-দু’দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন।”[1]

অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম পালনকারীর অনর্থক কথাবার্তা ও অশালীন আচরণের কাফফারাস্বরূপ এবং গরীব-মিসকীনদের আহারের সংস্থান করার জন্য যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে তা পরিশোধ করে (আল্লাহর নিকট) তা গ্রহণীয় যাকাত হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পর তা পরিশোধ করে, তাও দানসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি দান”।[2]

যাকাতুল ফিতর বণ্টনের খাতসমূহ:

যাকাতের যে খাতসমূহ উল্লিখিত হয়েছে, সে খাতগুলোই যাকাতুল ফিতরের খাত। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে যে আট খাতের কথা বলেছেন তাতেই তা বণ্টন করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ......﴾ [التوبة: ٦٠]

“নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য......”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫১১।

[2] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮২৭। আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬০৯। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

তবে তাদের মধ্য থেকে ফকীর ও মিসকীনকে দান করা অধিক উত্তম। কেননা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণিত হাদীস থেকে তা বুঝা যায়, যাতে বলা হয়েছে,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন সাওম পালনকারীকে অহেতুক ও অশ্লীল কথা থেকে পবিত্র করার উদ্দেশে ও মিসকীনদের খাবার দানস্বরূপ”।[1]

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬০৯। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ১৪৮৮। ইমাম হাকিম রহ. বলেছেন, হাদীসটি বুখারীর শর্তে; তবে তিনি এ সনদে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন নি। ইমাম যাহাবী রহ. ও এটাকে বুখারীর শর্তে বলেছেন।

চতুর্থ রুকন

সাওম

সাওমের সংজ্ঞা:

শাব্দিক অর্থ: বিরত থাকা।

পারিভাষিক অর্থে সাওম হলো: আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় স্বামী-স্ত্রীর মিলন হতে বিরত থাকা।

সাওমের ফযীলত:

সাওমের ফযীলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নরূপ:

১- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিন সাওম পালন করে, আল্লাহ ঐ দিনের বিনিময়ে জাহান্নামকে তার মুখমণ্ডল থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেন”।[1]

২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»

“জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৪০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৩।

তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে”।[1]

৩- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ[2] مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»

“যুদ্ধের মাঠে ঢাল যেমন তোমাদের রক্ষাকারী, সাওমও তদ্রূপ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল”।[3]

রমযান মাসের সাওমের হুকুম:

রমযান মাসের সাওম পালন করা ফরয। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা তা প্রমাণিত।

আল-কুরআন: আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

সুন্নাহ: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫২।

[2] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী: جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশের বাধা।

[3] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৬৩৯। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য দান, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা”।[1]

ইজমা: উম্মতের সবাই একমত যে, রমযানের সাওম পালন করা ফরয ও এটি ইসলামের একটি স্তম্ভ, যা সবারই জ্ঞাতব্য এবং সাওম অস্বীকারকারী মুরতাদ, ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত।

দ্বিতীয় হিজরীতে শা‘বান মাসের দু’দিন গত হওয়ার পর সোমবার সাওম ফরয হয়।

রমযান মাসের ফযীলত:

রমযান মাসে রয়েছে অনেক মর্যাদা, যা অন্য কোনো মাসে নেই। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিচে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

১- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»

“পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু‘আ থেকে আরেক জুমু‘আ পর্যন্ত এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে; যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে”।[2]

২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» “যে ব্যক্তি সাওয়াব প্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় রমযানের সাওম পালন করে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়”।[1]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩।

রমযানে সৎকাজের ফযীলত:

রমযান মাসে সৎকাজ করলে অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেকগুণ সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা রমযান মাসের রয়েছে নিজস্ব সম্মান ও মর্যাদা; যা অন্যান্য মাসের নেই। এখানে রমযান মাসে সৎকাজের অত্যাধিক সাওয়াবের কিছু নমুনা পেশ করা হলো:

১- রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“যে ব্যক্তি রমযান মাসে সাওয়াব প্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় রাতের কিয়াম করে (সালাত আদায় করে) আল্লাহ তা‘আলা তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেন”।[2]

২- রমযানে উমরা পালন করা; কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً»

“রমযান মাসের উমরা হজের সমতুল্য”।[3]

এছাড়াও রমযানে আরো অনেক ভালোকাজ রয়েছে, সেগুলো পালন করলে অধিক সাওয়াব পাওয়া যায়।

কীভাবে রমযান শুরু হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে:

দু’টি পদ্ধতির যে কোনো একটির দ্বারা রমযান মাসে উপণীত হওয়া সাব্যস্ত হবে। তাহলো:

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬০।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫৯।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯৯১। হাদীসের নস ইবন মাজাহ থেকে নেওয়া।

১- শা‘বান মাসের উনত্রিশ তারিখ দিবাগত রাতে (শা‘বানের ত্রিশতম রাতে) চাঁদ দেখা গেলে রমযান সাব্যস্ত হবে এবং পরের দিন থেকে সাওম পালন করা ফরয হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

“যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সাওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে”।[1]

রমযানের চাঁদ একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণলোক দেখলেই তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু শাওয়াল মাসে ঈদের চাঁদ দেখার জন্য কমপক্ষে দু’জন সৎলোকের সাক্ষ্য লাগবে।

২- কোনো কারণে উনত্রিশ শা‘বান রমযানের চাঁদ দেখা না গেলে শা‘বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করে, একত্রিশতম দিনকে রমযানের প্রথম দিন ধরে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সাওম পালন শুরু করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত হাদীসে বলেছেন,

«........ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

“.......আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন সিয়াম পালন করবে”।[2]

সাওম ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

মুসলিমের ওপর সাওম ফরয হওয়ার জন্য আকেল ও বালেগ হওয়া শর্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮১। হাদীসের নসটি মুসলিমের।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮১। হাদীসের নসটি মুসলিমের।

“তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়”।[1]

তাছাড়া মুসলিম ব্যক্তি সুস্থ হওয়া, মুকীম বা নিজ বাসস্থানে বসবাসকারী হওয়া (সফরে না থাকা), সাওম পালনে সক্ষম হওয়া, মহিলারা হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র থাকা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের দীনের ত্রুটি সম্পর্কে বলেছেন,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»

“আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না?”।[2]

কাদের জন্য সাওম ভঙ্গ করা জায়েয ও তা কাযা করতে হবে:

নিম্নোক্ত লোকদের জন্য সাওম ভঙ্গ করা জায়েয, তবে পরবর্তীতে তা কাযা করতে হবে:

১- অসুস্থ: অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রমযান মাসে সাওম ভঙ্গ করা বৈধ। যদি অসুস্থ ব্যক্তি সাওম ভঙ্গ করে আর তার অসুস্থতা এমন হয় যা সুস্থ হবে বলে আশা করা যায়, তবে সুস্থ হওয়ার পর যেসব সাওম ছুটে গেছে তা কাযা করতে হবে। আর যদি অসুস্থ ব্যক্তি বিনা কষ্টে সাওম পালন করতে পারে তবে সে সাওম পালন করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]

“তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪০৩। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২০৪১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪।

২- মুসাফির: কেউ সালাত কসর করা যায় এমন দূরত্ব[1] পরিমাণ সফর করলে তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা জায়েয। তবে সফর শেষে এসব সাওম কাযা করা ফরয। আর সফর যদি কষ্টকর না হয়, সেক্ষেত্রে সাওম ভঙ্গ না করাই উত্তম। পক্ষান্তরে সফর কষ্টকর হলে তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা উত্তম। কেননা নিম্নোক্ত হাদীসে এটি প্রমাণ হয়: আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ»

"রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতাম। এ সময় আমাদের কেউ সাওম পালন করেছেন, আবার কেউ সাওম ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু সাওম পালনকারী সাওম ভঙ্গকারীকে খারাপ মনে করতেন না আবার সাওম ভঙ্গকারীও সাওম পালনকারীকে খারাপ মনে করতেন না। তারা মনে করতেন, যার সামর্থ্য আছে সে-ই সাওম পালন করছে, এটিই তার জন্য উত্তম। আর যে দুর্বল সে সাওম ছেড়ে দিয়েছে, এটিও তার জন্য উত্তম"।[2]

৩- গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারী:

---

[1] অধিকাংশ সাহাবী ও তাবে'ঈ এর মত হচ্ছে যে কসরের দূরত্ব হচ্ছে চার বুর্দ। যা ইমাম মালেক, শাফে'ঈ, আহমাদ ও তার সঙ্গীগণ, লাইস ইবন সা'দ, আওযা'ঈ, আসহাবুল হাদীসের ফকীহগণ এবং অনুরূপগণের মত। সেটা অনুসারে ৪ বুর্দ হচ্ছে, ১৬ ফার্লং। সুতরাং চার বুর্দ হচ্ছে: ৪×১৬=৪৮ মাইল। আর এক মাইল হচ্ছে ১৭৪৮ মিটার। আল্লাহ ভালো জানেন। এ বিষয়ে আরও মতামত রয়েছে। কেউ বেশি জানতে চাইলে তার নির্দিষ্ট স্থানে দেখতে পারে। তবে একদিন একরাত্রির সফর হিসেবে নির্ধারণ করাই বেশি উপযুক্ত মত। সেটা পায়ে হাটার সফরই হোক বা বিমানের সফরই হোক।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১৬।

গর্ভাবস্থা অথবা দুগ্ধদান অবস্থায় নারী যদি তার নিজের ক্ষতির আশঙ্কা করে অথবা তার সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে অথবা তার নিজের ও সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে তবে তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা বৈধ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ»

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মুসাফির ব্যক্তির ওপর থেকে সাওম ও সালাতের একাংশ উঠিয়ে নিয়েছেন। আর গর্ভধারী ও দুগ্ধদানকারী নারীর ওপর থেকে তিনি সাওম উঠিয়ে নিয়েছেন”।[1]

উপরোক্ত তিন অবস্থায় ওযর শেষ হলে তাকে ক্বাযা করতে হবে অসুস্থ ব্যক্তির মতো। কিন্তু নিজের ক্ষতির কোনো ভয় না থাকে, শুধু বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে সে অবস্থায় তাকে কাযা করার সাথে ফিদিয়া তথা প্রতিদিনের সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে এক মুদ্দ পরিমাণ খাদ্যদান করতে হবে। এতে তার সাওম পরিপূর্ণ হবে এবং অত্যধিক সাওয়াব পাওয়া যাবে। গর্ভধারী ও দুগ্ধদানকারী নারী সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সাওম ভঙ্গ করলে সাওম কাযার পাশাপাশি ফিদিয়া আদায় করতে হবে বলে ইবন আব্বাস, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা, শাফে‘ঈ, আহমদ রহ. এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, শুধু ক্বাযা করলেই হবে, ফিদিয়া দিতে হবে না।

যেসব ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির সাওম ভঙ্গ করা জায়েয ও শুধু ফিদিয়া আদায় ওয়াজিব:

অতিবৃদ্ধ নারী-পুরুষ, এমন অসুস্থ যার সুস্থ হওয়ার আশা নেই এবং যারা এধরণের লোকদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যেসব লোকদের জন্য বছরের সব সময়-ই সাওম পালন করা অতিকষ্টকর তারা সাওম ভঙ্গ করবে এবং প্রতিটি

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৬৬৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সাওমের পরিবর্তে ফিদিয়া তথা একজন মিসকীনকে এক মুদ্দ পরিমাণ খাদ্যদান করবে। এদের কোনো কাযা নেই। কেননা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»

"অতিবয়স্ক লোকের জন্য সাওম ভঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারা প্রতিদিনের সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে এবং তার ক্বাযা নেই"।[1]

সাওমের রুকনসমূহ:

১- বিরত থাকা: সাওম ভঙ্গকারী কারণ খাদ্য, পানীয় স্বামী-স্ত্রীর মিলন ইত্যাদি হতে বিরত থাকা।

২- নিয়ত: আল্লাহর আদেশ পালন করতে ও তার নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় অন্তরে সাওমের দৃঢ় সংকল্প করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »

"প্রত্যেক কাজ নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল"[2]

ফরয সাওমের ক্ষেত্রে রাত থাকা অবস্থায় ফজরের পূর্বেই নিয়ত করা ফরয। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»

"যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে সাওমের নিয়ত করবে না, তার সাওম আদায় হবে না"।[3]

---

[1] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ১৬০৭, ইমাম হাকিম রহ. বলেন, হাদীসটি বুখারীর শর্তে; তবে তিনি বর্ণনা করেন নি। সুনান দারা কুত্বনী, হাদীস নং ২৩৮০। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

[3] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৫৪; সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ২৩৩৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে

আর নফল সাওমের ক্ষেত্রে সূর্যোদয় এমনকি দ্বিপ্রহরেও নিয়ত করা যাবে। তবে শর্ত হলো সুবহে সাদিকের পর থেকে সে সময় পর্যন্ত কিছু পানাহার না করা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীস এর দলীল। তিনি বলেন,

«قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে বললেন, "হে আয়েশা! তোমাদের কাছে কি কোনো (খাবার) আছে? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে কোনো কিছু নেই। তিনি বললেন, তাহলে আমি সাওম পালন করলাম"।[1]

৩- সময়: রমযানে সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওম পালন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَكُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ ١٨٧﴾ [البقرة: ١٨٧]

"আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

সাওমের সুন্নতসমূহ:

১- সাহরী খাওয়া: সাওম পালনের নিয়তে শেষরাতে সাহরীর সময় কিছু খাওয়া ও পান করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»

"তোমরা সাহরী খাও; কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে"।[2]

সহীহ বলেছেন।

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৪।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৯৫।

২- বিলম্বে সাহরী খাওয়া: তাছাড়া বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। তবে অবশ্যই সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার (ফজরের আযানের) পূর্বেই শেষ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

«لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ، وَأَخَّرُوا السُّحُورَ»

"আমার উম্মতেরা ততোদিন পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে যতোদিন তারা ওয়াক্ত হওয়ামাত্রই ইফতার করবে এবং বিলম্বে সাহরী খাবে"।[1]

৩ -সুর্যাস্তের সাথে সাথেই দ্রুত ইফতার করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»

"লোকেরা যতো দিন যাবৎ ওয়াক্ত হওয়া মাত্র ইফতার করবে, ততোদিন তারা কল্যাণের ওপর থাকবে"।[2]

৪- তাজা বা শুকনা খেজুর বা পানি দিয়ে ইফতার করা। এগুলো ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ একটি পাওয়া না গেলে অন্যটি দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব। কেননা আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ইফতার করেছেন। আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[1] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২১৩১২। লেখক হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, কিন্তু মুসনাদে আহমদের মুহাক্কিক আল্লামা শু'আইব আরনাউত হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছনে। মুসনাদ আহমদ: (৩৫/২৪১)। মু 'জাম আল কাবীর, হাদীস নং ৩৯৫, তিনি উম্মে হাকিম বিনত ওদায়া' থেকে বর্ণনা করেন। মাজমাউয যাওয়ায়েদে আল্লামা হাইসামী রহ. বলেছেন, "এ সনদের নারীদের থেকে ইবন মাজাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি এবং তাদেরকে জারাহ বা তা'দীল কোনোটিই করেন নি"। মাজমা'উয যাওয়ায়েদ: (৩/১৫৫)। -অনুবাদক

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৫৭।

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের পূর্বে বেজোড় সংখ্যক তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর দিয়ে। আর খেজুর না পেলে তিনি কয়েক ঢোক পানি পান করে ইফতার করতেন"।[1]

৫- সাওম পালনকারী সাওম অবস্থায় বিশেষ করে ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে দো'আ করা। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ»

"তিন ব্যক্তির দো'আ আল্লাহর কাছে কবুল হয়। তারা হলেন: সাওম পালনকারী, মুসাফির ও নির্যাতিত ব্যক্তি দো'আ"।[2]

তাছাড়া 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي»

"ইফতারের সময় সাওমপালনকারীর অবশ্যই একটি দো'আ আছে, যা প্রত্যাখ্যান করা হয় না (কবুল হয়)। ইবন আবু মুলাইকা রহ. বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইফতারের সময় বলতে শুনেছি: "হে আল্লাহ! আমি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যা সব কিছুর উপর পরিব্যপ্ত; যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেন"।[3]

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৫৬। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১২৬৬৭। আল্লামা শু'আইব আরনাউত বলেছেন, "হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

[2] শু'আবুল ঈমান লিল বাইহাকী, হাদীস নং ৩৩২৩। হাদীসটি সহীহ।

[3] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৭৫৩। ইমাম বুসীরী রহ. যাওয়ায়েদে হাদীসের সনদটিকে সহীহ

সাওমের মাকরূহসমূহ:

সাওম পালনকারীর জন্য কিছু কাজ করা মাকরূহ, কারণ এর মাধ্যমে তার সাওম নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদিও এ কাজগুলো সরাসরি সাওম নষ্ট করে না। তন্মধ্যে যেমন,

১- অযুর সময় কুলি ও নাকে পানি দেওয়ায় অতিরঞ্জিত করা। কেননা এরূপ করলে পেটে পানি চলে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে সাওম ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে। এতদসংক্রান্ত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

“আর নাকে পানি দেওয়ায় তুমি অতিরঞ্জন করো, তবে যদি সাওম পালনকারী হও তা করো না”।[1]

২- যে নিজেকে সংযম করতে পারবে না তার দ্বারা স্ত্রীকে চুম্বন করা। অনুরূপভাবে তার দ্বারা স্ত্রীর শরীর স্পর্শ ও ঘর্ষণ করা।

৩- স্ত্রীর প্রতি পলকহীনভাবে একাধারে তাকিয়ে থাকা এবং যৌন কাজের চিন্তা করা।

৪- ওযর ছাড়া খাদ্য ও পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করা।

৫- চুইংগাম জাতীয় কিছু চিবানো; কারণ সেগুলোর কোনো অংশ গলার ভিতর চলে যেতে পারে।

সাওম ভঙ্গের কারণসমূহ:

কিছু কারণে সাওম ভঙ্গ হলে শুধু ক্বাযা ওয়াজিব, আবার কিছু কারণে সাওম ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা দু’টি-ই ওয়াজিব।

বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ‘য়ীফ বলেছেন।

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০৭। আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ক- যেসব কারণে সাওম ভঙ্গ হলে শুধু ক্বাযা ওয়াজিব:

১- ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ভুলে বা জোরপূর্বক কেউ খাওয়ালে সাওম ভঙ্গ হবে না। বরং তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সাওম পূর্ণ করতে হবে। কাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»

"যে ব্যক্তি সাওমের কথা ভুলে গেলো, অতঃপর খেলো ও পান করলো, সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে; কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন"।[1]

২- কেউ সুর্যাস্ত হয়েছে ভেবে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে পরে যদি প্রমাণিত হয় যে, দিন অবশিষ্ট ছিল তাহলে তার ওপর উক্ত সাওমের ক্বাযা ওয়াজিব।

৩- সাওমের কথা স্মরণে থাকা সত্ত্বেও অতিরঞ্জিতভাবে কুলি বা নাকে পানি দেওয়ার ফলে পেটে পানি চলে গেলে উক্ত সাওমের ক্বাযা আদায় করতে হবে। এমনিভাবে খাদ্য জাতীয় কিছু পেটে চলে গেলেও কাযা ওয়াজিব। এমনিভাবে খাদ্য জাতীয় ইনজেকশন শরীরে ঢুকালেও সাওম ক্বাযা করতে হবে।

৪- সাধারণত যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় না এ জাতীয় খাবার মুখ দিয়ে পেটে চলে গেলে, যেমন: অনেক লবন। এতে সাওম ক্বাযা করতে হবে।

৫- জাগ্রত অবস্থায় হস্তমৈথুন বা স্ত্রীর শরীর স্পর্শ বা চুম্বন বা তার দিকে একনাগাড়ে চেয়ে থাকার কারণে ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত হলে সাওম ভেঙ্গে যাবে ও কাযা আদায় করতে হবে। তবে স্বপ্নদোষ হলে সাওম ভঙ্গ হবে না। কেননা এটি সাওম পালনকারীর ইচ্ছাধীন নয়।

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৫।

৬- ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করলে। তবে কারো অনিচ্ছা সত্ত্বেও বমি হলে তার সাওম ভঙ্গ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»

"কারো (সিয়ামকালে) অনিচ্ছকৃত বমি হলে তাকে ক্বাযা করতে হবে না। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে তবে সে কাযা করবে"।[1]

৭- সাওমের নিয়ত ভেঙ্গে ফেললে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদিও সে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ না করে থাকে।

৮- মুরতাদ হয়ে গেলে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে; যদিও আবার ইসলামে ফিরে আসে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ ٦٥ ﴾ [الزمر: ٦٤]

"তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত, আয়াত: ৬৪]

খ- যেসব কারণে সাওম ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ক্বাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়:

১- ইচ্ছাকৃত সহবাস করলে সাওম ভেঙ্গে যাবে। এতে কাযা ও কাফফারা দু'টি-ই আদায় করতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «تَجِدُ رَقَبَةً؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ، وَالعَرَقُ المِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৭২০। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৮০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

"এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো এবং বললো: আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কী? সে বললো, রমযানে (দিবাভাগে) আমি স্ত্রী সম্ভোগ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোনো গোলামের ব্যবস্থা করতে পারবে? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কি ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বললো, না। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিমধ্যে জনৈক আনসারী এক 'আরক' খেজুর নিয়ে হাযির হলো। (আরক হলো নির্দিষ্ট মাপের খেজুরপাত্র।) তখন তিনি বললেন, যাও, এটি নিয়ে গিয়ে সদকা করে দাও। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্থ কাউকে সাদকা করে দিবো? যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, কংকরময় মরুভূমির মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ মদীনায়) আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্থ কোনো ঘর নেই। শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা, যাও এবং তা তোমার পরিবার-পরিজনদের খাওয়াও"।[1]

সাওমের কাফফারা হলো একজন মুমিন দাস মুক্ত করা। দাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে দু'মাস একাধারে সাওম পালন করা। দু'মাস সাওম পালনে অক্ষম হলে ৬০জন মিসকীনকে মধ্যমানের খাবার প্রদান করা। কাফফারা ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হবে। দাস আজাদ করতে সক্ষম হলে সাওম পালন করলে কাফফারা আদায় হবে না, এমনিভাবে সাওম পালনে সক্ষম হলে ৬০জন মিসকীনকে খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না। প্রতি মিসকীনকে সাধ্যমত এক মুদ পরিমাণ গম, যব বা খেজুর দান করলেই হবে। কেউ

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১১।

রমযানে দিনের বেলায় একবার ইচ্ছাকৃত সহবাস করলে মাসের শেষে আবার যদি ইচ্ছাকৃত সহবাস করে তবে তাকে দু'বার কাফফারা দিতে হবে। তবে অনেকের মতে একবার কাফফারা দিলেই চলবে।

রমযানে যেসব কাজ করা বৈধ:

রমযান মাসে দিনের বেলায় নিম্নোক্ত কাজ করা বৈধ:

১-পানিতে নামা, ডুবানো, পানিতে শরীর ঠাণ্ডা করা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ»

"নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনজনিত জুনূবী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফজরের সময় হয়ে যেতো। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সাওম পালন করতেন"।[1]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সাওম অবস্থায় মাথায় ঠাণ্ডা পানি দিয়েছেন।

«قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ: الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ»

"আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, উক্ত ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরজ' নামক স্থানে এমতাবস্থায় দেখি যে, তিনি সায়িম অবস্থায় তৃষ্ণার্ত হওয়ার কারণে গরমের ফলে স্বীয় মস্তকে পানি ঢালছিলেন।[2]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৬।

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৬৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

২- জুনুবী অবস্থায় সকাল করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন যা পূর্বোল্লিখিত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর তা ছিল রমযানের সাওমে।

৩- সুবহে সাদিক স্পষ্টভাবে উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»

“বিলাল রাতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা (সাহরী) পানাহার করতে থাক; যতক্ষণ না ইবন উম্মে মাকতুম আযান দেয়”।[1]

৪- রাতের বেলায় হায়েয ও নিসাফ শেষ হলে সকাল পর্যন্ত গোসলে বিলম্ব করা জায়েয এবং এমতাবস্থায় সাওম পালন করা সঠিক হবে, অতঃপর গোসল করে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করবে।

৫- জমহুর আলেমের মতে, দিনের যে কোনো সময় মিসওয়াক করা জায়েয। কেননা মিসওয়াক সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ‘আম, কোনো সময়কে খাস করে নি। যেসব হাদীস সায়িম অবস্থায় শেষবেলায় মিসওয়াক করা মাকরূহ বলেছে আলেমগণ সেসব হাদীসকে দ‘য়ীফ বলেছেন।

৬- বৈধকাজে সফর করা জায়েয; যদিও এ সফরের কারণে সাওম ভঙ্গ করতে হয়।

৭- মুখের ভিতরে না গেলে সেসব ঔষধ গ্রহণ করা জায়েয। যেমন: খাদ্য হিসেবে গ্রহণীয় নয় এমন ইনজেকশন নেওয়া জায়েয।

৮- মুখের ভিতরে না যাওয়ার শর্তে খাদ্যদ্রব্য চর্বন করা ও স্বাদ দেখা জায়েয।

৯- আতর, সুগন্ধি, আগরবাতির ধোঁয়া ও সুগন্ধির ঘ্রাণ নেওয়া জায়েয।

নফল সাওম:

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৯২।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত সাওমসমূহ পালন করতে উৎসাহিত করেছেন।

১- শাওয়াল মাসের ছয়টি সাওম পালন করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

“যে ব্যক্তি রমযানের সাওম পালন করল, অতঃপর এর পেছনে শাওয়াল মাসে ছয় দিন সাওম পালন করল সে যেন সারা বছর সাওম পালন করল”।[1]

২- প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ - أَوْ: كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ - فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - أَوْ: لِكُلِّ مُؤْمِنٍ - إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ، فَيَقُولُ: أَخِّرْهُمَا " »

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করে থাকেন কেন? তিনি বলেন: নিশ্চয় প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলনামা পেশ করা হয়, আল্লাহ তা‘আলা সোমবার ও বৃহস্পতিবার এ দু’দিন পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যতীত প্রত্যেক মুসলিম অথবা মুমিনকে ক্ষমা করেন। তিনি (ফিরিশতাদের) বলেন: তারা সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া অবধি তাদের ত্যাগ করো”।[2]

৩- প্রতিমাসের তিনদিন (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) সাওম পালন করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৪।

[2] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৭৪০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

«صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»

"প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন করা সারা বছর সাওম পালন করার মতো। এ তিন দিন হলো আইয়্যামে বীয তথা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ"।[1]

৪- যিলহজ মাসের প্রথম দশদিন সাওম পালন করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي الْعَشْرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

"আল্লাহর নিকট যুল হজের দশ দিনের সৎকাজের চাইতে অধিক পছন্দনীয় সৎকাজ আর নেই। সহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি তার জান-মালসহ আল্লাহর পথে বের হয়ে তার কোনো কিছু নিয়ে আর ফিরে আসে না (তার মর্যাদা অনেক)"।[2]

তন্মধ্যে বেশি তাগিদ রয়েছে আরাফার দিনের সাওম। আর তা হচ্ছে হাজী ব্যতীত অন্যদের জন্য নয় তারিখের সাওম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً»

"আরাফাত দিবসের সাওম একবছর পূর্বের ও পরের গুনাহের কাফফারা হয়।"।[3]

---

[1] সুনান নাসাঈ আল কুবরা, হাদীস নং ২৭৪১। হাদীসটি হাসান।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬২।

৫- মুহাররম মাসে সাওম পালন করা। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো,

أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ»

"রমযান মাসের সিয়ামের পর কোনো সাওম সর্বোত্তম? তিনি বললেন, রমযান মাসের সিয়ামের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের সাওম সর্বোত্তম"।[1]

৬- আশুরার সাওম পালন করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً»

"আশুরা দিবসের সাওম এর পূর্বের এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়"।[2] তবে দশ তারিখের সাথে ৯ তারিখ একটি সাওম বেশি রাখা মুস্তাহাব, যাতে ইয়াহূদী নাসারাদের বিরোধিতা করা হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদী এবং নাসারাদের আশুরার ১০ তারিখে সম্মান করতে দেখে তিনি বলেছেন,

«فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও সিয়াম পালন করবো। বর্ণনাকারী বলেন, এখনো আগামী বছর আসেনি, স্থাএমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যান"।[3]

যে দিনগুলোতে সাওম পালন করা হারাম:

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৩।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬২।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৩৪।

১- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে সাওম পালন করা হারাম। কেননা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

«إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুই দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিতরের দিন) যেদিন তোমরা তোমাদের সাওম ছেড়ে দাও। আরেক দিন হলো, যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও (ঈদুল আযহা)”।[1]

২- আইয়্যামে তাশরীক তথা যিলহজের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ এ তিনদিন সাওম পালন করা হারাম। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবন হুযাফাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে মিনার ময়দানে এ ঘোষণা দিয়ে পাঠালেন যে,

«لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

“তোমরা এ দিনগুলোতে সাওম পালন করো না; কেননা এ দিনগুলো হলো পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন”।[2]

তবে তামাত্তু ও কারিন হাজীগণ যদি হাদই না পান তবে তাদের সাওম পালন করা এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

৩- মহিলাদের জন্য হায়েয ও নিফাসের দিনে সাওম পালন করা হারাম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের সম্পর্কে বলেছেন,

«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৩৭।

[2] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১০৬৬৪। আল্লামা শু‘আইব আরনাউত বলেন, হাদীসটি সহীহ, তবে এ সনদটি দ‘য়ীফ।

“আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন: এ হচ্ছে তাদের দীনের ত্রুটি”।[1]

আলেমগণের ইজমা‘ হয়েছে যে, হায়েয ও নিফাস অবস্থায় সাওম পালন করলে সে সাওম সঠিক হবে না।

৪- স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় নারীর নফল সাওম পালন করা। কেননা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

“কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময়ে (স্বামীর অনুমতি ছাড়া) কোনো (নফল) সাওম পালন করবে না”।[2]

যেসব দিনগুলোতে সাওম পালন করা মাহরূহ:

১- হাজীগণের ‘আরাফার দিনে সাওম পালন করা মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»

“আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশরীকের দিনগুলো মুসলিমদের জন্য ঈদস্বরূপ। এ দিনগুলো পানাহারের জন্য নির্ধারিত”।[3]

২- শুধু জুমু‘আর দিনে সাওম পালন করা মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০২৬।
এখানে নিষেধাজ্ঞাটি হারাম হিসেবে গণ্য। এটি জমহুর আলেমের মত। ইমাম নাওয়াওয়ী ও ইবন হাজার রহ. এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

[3] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪১৯। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

“তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু‘আর দিনে সাওম পালন না করে; কিন্তু তার আগে একদিন বা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমু‘আর দিনে পালন করা যায়)”।[1]

৩- শুধু শনিবার সাওম পালন করা। অর্থাৎ এ দিনকে সাওমের জন্য নির্ধারণ করা মাকরূহ। কেননা ইয়াহূদীরা এ দিনের সম্মানে সাওম পালন করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ»

“ফরয সিয়াম ব্যতীত শনিবার তোমরা কোনো সিয়াম পালন করবে না। যদি তোমাদের কেউ আঙ্গুরের খোশা বা গাছের ডাল ছাড়া আর কিছু না পায় তবে তাই যেন সে চিবিয়ে নেয়”।[2]

৪- সারা বছর বিরতিহীনভাবে একাধারে সাওম পালন করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ»

“যে সারা বছর সাওম পালন করে সে যেন সাওম পালন করে না”।[3]

৫- সাওমুল বিসাল তথা দু বা ততোধিক দিন বিনা ইফতারে লাগাতার সাওম পালন করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ» «

“তোমরা সাওমে বেসাল (লাগাতার সাওম) পালন করা থেকে বিরত থাকো”।[4]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪৪।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ৭৪৪, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪২১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৯।

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১০৩।

«لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»

“তোমরা সাওমে বেসাল পালন করবে না। যদি বেসাল করতেই হয় তবে যেন সাহরী পর্যন্ত করে”।[1]

৬- ইয়ামুশ-শাক তথা শাবান মাসের ত্রিশতম দিনে সাওম পালন করা। আম্মার ইবন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

«مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

“সন্দেহযুক্ত দিনে যে লোক সাওম পালন করে সে লোক আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি করে”।[2]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ»

“তোমরা রমযানের একদিন বা দুদিন পূর্বে সওম পালন করবে না। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি এ সময় সওম পালন করতে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে সাওম পালন করতে পারে”।[3]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৬১।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ৬৮৬। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আম্মার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসটি হাসান। সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ২১৮৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮২।

পঞ্চম রুকন

হজ

হজের পরিচিতি:

হজ (حج) শব্দের হা বর্ণে ফাতহা ও কাসরা উভয়টি দিয়েই পড়া যায়। আভিধানিক অর্থ: ইচ্ছা করা ও কোনো গন্তব্যের দিকে গমন করা। কোনো কাজ বারবার করা।

পারিভাষিক অর্থে: কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিশেষ ইবাদত আদায়ের উদ্দেশে সুনির্দিষ্ট সময়ে বাইতুল্লাহর উদ্দেশে গমন করা।

হজের হুকুম:

মক্কায় গমন করতে সক্ষম সকল নারী পুরুষের ওপর হজ পালন করা ফরয। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা হজ ফরয হওয়া সাব্যস্ত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧﴾ [آل عمران: ٩٧]

“এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য দান,

সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা”।[1]

সকল মুসলিম একমত যে, হজ পালন করা ফরয। এটি ইসলামের একটি রুকন এবং দীনের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়। যে ব্যক্তি হজকে অস্বীকার করবে সে কাফির ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

তাছাড়া সব আলেম এ ব্যাপারেও একমত যে, জীবনে একবার হজ পালন করা ফরয। তবে কেউ মানত করলে ভিন্ন কথা। মানত করলে তাকে উক্ত হজ আদায় করা ফরয। এছাড়া কেউ অতিরিক্ত করলে সেটা মুস্তাহাব।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। এতে তিনি বললেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ "، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»

“হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ পালন করবে। তখন এক ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহর রাসূল। প্রতি বছর কি হজ করতে হবে? তিনি চুপ রইলেন এবং লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা প্রতি বছরের জন্যেই ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হতো না। তিনি আরো বললেন: “যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে কিছু বলি নি সে বিষয় সেরূপ থাকতে দাও। কেননা তোমাদের

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬।

পূর্বে যারা ছিল তারা বেশি প্রশ্ন করার ও তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। কাজেই আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেই, তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করবে, আর যখন কোনো বিষয়ে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ করবে"।[1]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এতে তিনি বললনে,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمِ الْحَجُّ. قَالَ: فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ»

"হে মানব সকল! তোমাদের ওপর হজ ফরয করা হয়েছে"। তখন আকরা' ইবন হাবিস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল প্রতি বছরই কি হজ পালন করা ফরয? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি যদি হ্যাঁ বলি তাহলে তা প্রতি বছরই আদায় করা ফরয হবে। আর যদি তোমাদের ওপর প্রতি বছর হজ পালন ফরয করা হয় তোমরা তা পালন করবে না এবং তোমাদের সাধ্যও হবে না। জীবনে একবার হজ পালন করা ফরয। অতিরিক্ত যা করা হবে তা নফল"।[2]

হজের ফযীলত:

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৭।

[2] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৬৪২, শু'আইব আরনাউত হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছনে। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩১৫৫। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন; কিন্তু তারা এ সনদে বর্ণনা করেন নি। ইমাম যাহাবী রহ. ও বুখারী ও মুসলিমের শর্তে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শরী'আত প্রণেতা হজ পালনে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন এবং হজের অপরিসীম সাওয়াব ও মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। নিম্নোক্ত হাদীসসমূহে হজের ফযীলত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

১- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে"।[1]

২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ»

"এক উমরার পর আর এক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হল হজ্জে মাবরূরের (কবুল হজের) প্রতিদান"।[2]

৩- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

«أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»

"সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, হজে মাবরুর (মাকবুল হজ)"।[3]

৪- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের ফযীলত সম্পর্কে আরো বলেছেন,

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২১' সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৫০।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৯।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৩।

«تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ»

"তোমরা ধারাবাহিক হজ ও উমরা আদায় করতে থাকো। এ দুটো আমল দারিদ্র ও গুনাহ দূর করে দেয়। যেমন ভাটার আগুনে লোহা ও সোনা-রুপার ময়লা-জং দূরিভূত হয়ে থাকে। একটি কবুল হজের প্রতিদান তো জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়"।[1]

এছাড়াও হজের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

হজ ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

১- ইসলাম।

২- বালিগ হওয়া।

৩- আক্কল বা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।

৪- স্বাধীন হওয়া।

সালাত ও সাওম অধ্যয়ে উপরোক্ত চারটি শর্তের দলীল উল্লেখ করা হয়েছে।

৫- হজে গমনের সামর্থ্য থাকা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٩٧﴾ [آل عمران: ٩٧]

"এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

হজের রুকনসমূহ:

হজের রুকন চারটি। সেগুলো হলো:

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৮১০। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ গরীব বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১- ইহরাম।

২- ‘আরাফায় অবস্থান।

৩- বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।

৪- সাফা ও মারওয়ায় সা‘ঈ করা।

এ চারটি রুকনের কোনো একটি ছুটে গেলে হজ বাতিল হয়ে যাবে।

প্রথম রুকন: ইহরাম:

ইহরাম হলো: হজ বা উমরা পালনের নিয়তে হজ বা উমরার কাজে প্রবেশের নিয়ত করা। সাধারণ পোশাক ছেড়ে ইহরামের পোশাক পরিধান ও তালবিয়ার সময় নিয়ত করতে হবে।

ইহরাম তিন প্রকার:

১- তামাত্তু‘

২- কিরান

৩- ইফরাদ।

তামাত্তু‘ শব্দের অর্থ:

হজের মাসসমূহে উমরার উদ্দেশে ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর উমরা আদায় করে শেষ করবে ও হালাল হয়ে যাবে। এরপর একই বছর ইয়াওমুত তারবিয়াহ তথা ৮ই যিলহজ শুধু হজের নিয়ত করবে। অতঃপর হজের যাবতীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে আদায় করবে। মসজিদে হারামের বাসিন্দা না হলে তামাত্তু‘র জন্য হাদী যবাই করবে।

কিরান:

মিকাত থেকে হজ ও উমরা উভয়টির জন্য একসাথে নিয়ত করা। অথবা প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধা। অতঃপর তাওয়াফের আগে হজের নিয়ত করা। জামরায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত একই ইহরামে থাকা, পাথর নিক্ষেপের পরে মাথা

মুণ্ডন করা বা চুল খাটো করা। তামাত্তু‘ হাজির মত কিরান হাজিকেও হাদী যবাই দিতে হবে।

ইফরাদ:

ইফরাদ হজ হলো উমরা ব্যতীত শুধু হজের নিয়ত করা। জামরায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত একই ইহরামে থাকা, পাথর নিক্ষেপের পরে মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা। ইফরাদ হাজিকে হাদী যবাই দিতে হবে না। **ইহরামের ওয়াজিব, সুন্নত ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ:**

ইহরামের ওয়াজিব কাজসমূহ:

ইহরামের এসব কাজ বাদ পড়লে হজ পালনকারীর ওপর দম দেওয়া ওয়াজিব হয়। দম দিতে অক্ষম হলে দশদিন সাওম পালন করতে হয়। ইহরামের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ:

১- মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং হজ বা উমরা পালনকারীকে ইহরামের নিয়ত ব্যতীত মক্কার উদ্দেশ্যে এ সব স্থান অতিক্রম করা জায়েয নেই। এসব জায়গা হলো:

ক- যুলহুলাইফা: মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত। স্থানটি বর্তমানে আবইয়ারে আলী বলে খ্যাত। যুলহুলাইফা মদীনাবাসী ও মদীনার দিক থেকে আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত।

খ- আল-জুহফা: এটি সমুদ্রতীরবর্তী পুরাতন একটি শহর। বর্তমানে এ শহরের নিদর্শন অনেকটাই চলে গেছে। তাই লোকেরা সেটার বদলে রাবেগ শহর থেকে ইহরাম বাঁধে। । এটি সিরিয়া, মিসর ও মরক্কোসহ পশ্চিমাঞ্চল থেকে আসা আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত।

গ- ইয়ালামলাম: এটি মূলত: পাহাড়। বর্তমানে এর নাম ‘আসসাআ‘দিয়াহ’। এটি ইয়েমেন ও ইয়ামেনের দিক থেকে আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত।

ঘ- কারনুল মানাযিল: বর্তমানে এর নাম 'আস-সাইলুল কাবীর'। এটি নাজদবাসী ও এদিক থেকে দিক থেকে আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত।

ঙ- যাতু ইরক: এটি ইরাক ও এর ওপারের দেশবাসীদের দিক থেকে আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত।

চ- যাদের বাড়ি উপরোক্ত মিকাতের অভ্যন্তরে মক্কার দিকে, তাদের হজ ও উমরার মিকাত নিজের ঘর থেকে শুরু করতে হবে। তবে যাদের বাড়ি মক্কার মধ্যে তারা হারাম এলাকার বাড়ি থেকে বের হয়ে 'হিল' বা হালাল এলাকায় এসে উমরার নিয়ত করবে। আর হজের জন্য মক্কায় বসেই নিয়ত করবে।

মিকাতের দলীল নিম্নোক্ত হাদীস: ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ ও উমরার নিয়তকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান এবং মীকাতের ভিতরে স্থানের লোকেরা নিজ বাড়ি থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে"।[1]

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮১।

ফায়েদা: উপরে যা উল্লেখ করা হলো তা মিকাতে মাকানী বা স্থানের মিকাত। হজ এর যামানী বা সময়েরও মিকাত রয়েছে। সেগুলো হলো:

হজের কাল-বিষয়ক মিকাত হলো হজের মাসসমূহ। আর তা হলো, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ মাসের প্রথম দশদিন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: ١٩٧]

"হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৭]

কেউ এ সময়ের আগে হজের নিয়ত করলে তার ইহরাম বৈধ হবে না। অপরদিকে কেউ যিলহজ মাসের দশ তারিখ সূর্যোদয়ের আগে ইহরাম বেঁধে 'আরাফায় অবস্থান করলে তার হজ শুদ্ধ হবে।

২- সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করা:

মুহরিম সেলাইকৃত জামা, কামিছ, টুপিওয়ালা জামা, পাগড়ি পরবে না। কোনো কিছু দিয়ে মাথা ঢেকে রাখবে না। চামড়ার মোজা বা কাপড়ের মোজাপরবে না। জাফরান ও ওয়ারস লাগানো পোশাকও পরিধান করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، ولا العمامة وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ الخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لاَ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»

"মুহরিম জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপিওয়ালা জামা এবং মোজা পরবে না। তবে যদি সে জুতা সংগ্রহ করতে না পারে, তা হলে মোজা পরতে পারবে, তবে সে যেন সেটার টাখনুর নিচের অংশ কেটে নেয়"।[1]

পক্ষান্তরে নারী সে তার মুখের উপর থাকা বুরকা ও নিকাব দূর করবে, হাতের উপর থাকা হাতমোজাও সরিয়ে রাখবে। তবে মহিলা তার চেহারার উপর উড়না রাখতে পারবে যা দ্বারা তার পাশ দিয়ে গমনকারী বেগানা লোকদের থেকে

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৭।

চেহারা ঢেকে রাখবে, যদিও সেটা চেহারা স্পর্শ করে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»

"মুহরিম মহিলাগণ মুখে নেকাব এবং হাতে হাত মোজা লাগাবে না"।[1]

ইহরামের সুন্নতসমূহ:

১- ইহরামের জন্য গোসল করা। হায়েয ও নিফাস হলেও গোসল করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالحَائِضَ[2] تَغْتَسِلُ، وَتُحْرِمُ، وَتَقْضِي المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ»

"হায়েয ও নেফাসবতী মহিলারা গোসল করে ইহরাম বাঁধবে এবং হজের সব আমল পুরা করবে। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করবে না"।[3]

২- একটি চাদর এবং সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরে ইহরাম বাঁধা। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ চুল আঁচড়িয়ে, তেল মেখে, লুঙ্গি ও চাদর পরে (হজের উদ্দেশ্যে) মদীনা থেকে রওয়ানা হন"।[1]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।

[2] খাত্তাবী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েয ও নেফাসবতী নারীকে গোসল করে ইহরাম বাঁধতে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং পবিত্র ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রযোজ্য।

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ৯৪৫, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৩৪৩৫। শু'আইব আরনাউত হাদীসের সনদটিকে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন।

৩- নখ কাঁটা, মোচ কাঁটা, বোগলের পশম উপড়ে ফেলা ও নাভীর নিচের লোম কামানো। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করেছেন। তাছাড়া হজের কাজ দীর্ঘদিন চলার কারণে এসব পশম লম্বা হয়ে যাবে, আর ইহরাম অবস্থায় এগুলো কাঁটাও যাবে না।

৪- ফরয বা নফল সালাতের পরে ইহরামের নিয়ত করা।

৫- নিয়তের পরে তালবিয়া পাঠ করা। তালবিয়া হলো নিম্নোক্ত এ দো'আ পড়া:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ»

"আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। আপনার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয় প্রশংসা ও নি'আমত আপনার এবং রাজত্বও, আপনার কোনো শরীক নেই"।[2]

পুরুষ উচ্চস্বরে এবং নারীরা এমনভাবে বলবে যেন পাশের লোক শুনতে পায়। মুস্তাহাব হচ্ছে, বেশি বেশি পরিমাণ ও বার বার তালবিয়া পাঠ করা । এরপরে দো'আ করা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ করা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

হজ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধলে নিম্নোক্ত কাজসমূহ করা নিষেধ:

১- মাথার চুল মুণ্ডানো, কাটা অথবা উপড়ে ফেলা। এমনিভাবে শরীরের অন্যান্য লোমও কাঁটা বা মুণ্ডানো বা উপড়ে ফেলা নিষেধ।

২- হাত ও পায়ের নখ কাটা।

৩- এমন কোনো কাপড় দিয়ে পুরুষের মাথা ঢেকে রাখা যা মাথার সাথে লেগে থাকে।

৪- পুরুষের ক্ষেত্রে সেলাই-করা পোশাক পরা। সেলাই করা পোশাক অর্থ এমন পোশাক যা মানুষের শরীরের মাপে অথবা কোনো অঙ্গের মাপে সেলাই করে

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৫।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৯।

তৈরি করা হয়েছে, যেমন স্বাভাবিক পরিধানের পোশাক, প্যান্ট-পাজামা, জামা, ইত্যাদি।

৫- ইহরামের পর শরীর, কাপড় অথবা অন্য কোথাও সুগন্ধি লাগানো।

কেউ উক্ত পাঁচটি কাজ করলে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। ফিদিয়া হলো তিন দিন সাওম পালন করা বা ৬জন মিসকিনকে এক মুদ পরিমাণ করে খাদ্য দেওয়া বা একটি ছাগল যবাই করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]

"আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদাকা অথবা পশু যবেহ এর মাধ্যমে ফিদয়া দেবে"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৬]

৬- স্থলজ শিকার-জন্তু হত্যা করা বা শিকার করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]

"হে মুমিনগণ, ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৯৫]

সুতরাং কেউ যদি ইচ্ছা করে তা হত্যা করে, তবে তাকে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]

"আর যে কেউ তোমাদের মধ্য থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে সে যেন অনুরূপ প্রাণি ক্ষতিপূরণ দেয়"। [সূরা আল-মায়িদা: ৯৫]

যেমন কেউ হরিণ, পাহাড়ী ছাগল ও খরগোশ ইত্যাদি শিকার করলে মিসকীনকে সমজাতীয় একটি প্রাণি ফিদিয়া দিতে হবে। নির্দিষ্ট প্রাণি পাওয়া না গেলে উক্ত প্রাণীর মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্য দান করতে হবে। মিসকিনদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতে হবে। খাদ্য ফিদিয়া দিতে সক্ষম না হলে যে কয়জন মিসকিনকে খাদ্য দেওয়ার তাদের পরিবর্তে সাওম পালন করবে।

৭- সহবাস বা সহবাসের পূর্বকাজ যেমন চুম্বন ইত্যাদি করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: ١٩٧]

"হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব, এ মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৭]

সহবাস করলে হজ বাতিল হয়ে যাবে। তাকে বাতিল হওয়া সত্বেও হজের বাকী কাজ পূর্ণ করতে হবে এবং পরের বছর আবার হজ করতে হবে। উমার ইবন খাত্তাব, আলী ইবন আবী তালিব ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মুহরিম অবস্থায় কেউ স্ত্রীসহবাস করলে কী করণীয়? তারা বললেন,

«يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ»

"তারা হজের বাকী কাজ সমাপন করবে। অতঃপর, পরের বছর পুনরায় হজ করবে এবং হাদী যবাই করবে"।[1]

দ্বিতীয় রুকন: তাওয়াফ:

কা'বার চারপাশে সাতবার ঘোরা (তাওয়াফ করা)।

তাওয়াফের প্রকারভেদ:

১- তাওয়াফুল কুদুম তথা মক্কায় আগমন করে যে তাওয়াফ করা হয়।

২- তাওয়াফুল ইফাদা। এটি হজের রুকন। কেউ এ তাওয়াফ বাদ দিলে তার হজ বাতিল হয়ে যাবে।

৩- তাওয়াফুল বিদা তথা মক্কা থেকে বিদায় বেলায় যে তাওয়াফ করা হয়। এটি হজের ওয়াজিব কাজ। কেউ এ তাওয়াফ ছেড়ে দিলে তাকে দম দিতে হবে।

[1] মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং ১৪২১।

৪- নফল তাওয়াফ।

তাওয়াফের কিছু শর্ত, সুন্নত ও আদাব রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

তাওয়াফের শর্ত:

১- নিয়ত: আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর আদেশ পালনে অন্তরে তাওয়াফের দৃঢ় সংকল্প করা।

২- ছোট বড় সব ধরণের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র থাকা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ»

“বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সালাতের মতোই, তবে আল্লাহ তাতে কথা বলা জায়েয করেছেন।”।[1]

৩- সতর ঢেকে রাখা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»

“মুশরিকেরা এ বছরের পর আর কোনো হজ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না”।[2]

৪- তাওয়াফে সাতটি চক্কর দেওয়া এবং হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা ও সেখানে এসে তাওয়াফ শেষ করা। কেনন জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে সেটা স্পর্শ করলেন, অতঃপর ডান

---

[1] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩০৫৮। ইমাম হাকিম ও যাহাবী উভয়ে এ হাদীসের হুকুম বর্ণনায় নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ২৯২২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬২২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৭।

দিকে হাঁটা শুরু করলেন, প্রথমে তিন চক্কর রমল তথা হেলেদুলে হাঁটলেন। অতঃপর পরে চার চক্কর স্বাভাবিক হাঁটলেন"।[1]

৫- তাওয়াফের সময় বাইতুল্লাহ যেন তাওয়াফকারীর বাম দিকে থাকে।

৬- মসজিদের ভিতর দিয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা, যদিও বাইতুল্লাহ থেকে দুর দিয়ে হয়।

৭- বাইতুল্লাহর বাহির থেকে তাওয়াফ করা। হাজরে আসওয়াদ ঘিরে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ হবে না। কেননা হাজরে আসওয়াদ ও শাযরাওয়ান (কা'বার মূল ভবনের সাথে লাগানো অংশ যাতে গিলাফ পরানো হয়) বাইতুল্লাহর অংশ।

৮- ধারাবাহিকভাবে ও বিরতিহীন তাওয়াফ করা। ওযরের কারণে সামান্য বিলম্ব করলে অসুবিধে নেই।

তাওয়াফের সুন্নতসমূহ:

১- হাজরে আসওয়াদের দিকে ফিরে তাওয়াফ শুরু করা ও সম্ভব হলে চুম্বন করবে অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করবে অথবা সেদিকে ইশারা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেছেন।

২- তাওয়াফে কুদূম ও উমরার সময় ইযতিবা করা। ইযতিবা হলো ডান বগলের নিচে চাদর রেখে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা। তাওয়াফ শেষে আবার চাদর ঠিক করে দেওয়া।

৩- পুরুষরা তাওয়াফে কুদূম ও উমরার তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা। রমল হলো দ্রুত পদে চলা। নারীরা রমল করবে না। বাকী চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে তাওয়াফ করবে।

ইদতেবা ও রামল দু'টিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে।

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

৪- তাওয়াফের প্রতি চক্করে রুকনে ইয়ামানীকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা, কিন্তু চুম্বন করবে না। সম্ভব না হলে সেখানে ভিড় করা উচিৎ নয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে হাত দিয়ে ইশারা করা শরী'আতসম্মত।

৫- রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এ দো'আ পড়বে:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের 'আযাব থেকে রক্ষা করুন"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০১]

৬- মুলতাযিমে দো'আ করা। আর মুলতাযিম হলো হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মধ্যবর্তী জায়গা। এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম দ্বারা সাব্যস্ত আছে।

৭- সাত তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে যাবে এবং এ আয়াত পড়বে:

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى﴾ [البقرة: ١٢٥]

"তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৫]

এ সময় মাকামে ইবরাহীম তার ও কা'বার মাঝখানে রাখবে। এর পিছনে দু রাকা'আত সালাত আদায় করবে। প্রথম রাকা'আতে সূরা আল-ফাতিহার পরে 'সূরা আল-কাফিরূন' এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা আল-ফাতিহার পরে সূরা আহাদ তথা কুল হুআল্লাহু আহাদ পড়বে।

৮- এ দু রাকা'আত সালাত শেষে যমযমের পানি পান করবে।

৯- সা'ঈ করার আগে হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে সম্ভব হলে স্পর্শ করবে। সম্ভব না হলে ভিড় করবে না।

তাওয়াফের আদবসমূহ:

১- কায়মনোবাক্যে ও একাগ্রচিত্তে তাওয়াফ করা। তাওয়াফের সময় আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত্ব স্মরণ করা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

২- অতিপ্রয়োজন ব্যতীত কথাবার্তা না বলা। একান্ত যদি কথা বলতেই হয় তাহলে ভালো কথা বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ»

“বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সালাতের মতোই, তবে আল্লাহ তাতে কথা বলা জায়েয করেছেন। সুতরাং কেউ তাওয়াফ অবস্থায় কথা বললে সে যেন উত্তম কথা বলে”।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ»

“বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করাও সালাতের ন্যায়। অতএব, কথা কমই বলবে”।[2]

৪- বেশি বেশি যিকির ও দো‘আ করা।

৫- কথা ও কাজে কোনো মুসলিমকে কষ্ট না দেওয়া।

তৃতীয় রুকন: সা‘য়ী:

সা‘ঈ হলো সাফা ও মারওয়ার মাঝে ইবাদতের নিয়তে হাঁটা। এটি হজ ও উমরার রুকন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]

“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৮]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ"

---

[1] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩০৫৮। ইমাম হাকিম ও যাহাবী উভয়ে এ হাদীসের হুকুম বর্ণনায় নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ২৯২২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ২৯২২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। বায়হাকী আল-কুবরা, হাদীস নং ৯২৯৩।

“তোমরা সাফা ও মারওয়ায় সা‘ঈ করো, কেননা আল্লাহ তোমাদের ওপর সা‘ঈ ফরয করেছেন”।[1]

সা‘ঈর শর্তাবলী:

১- নিয়ত করা: কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

“প্রত্যেক কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল”[2]

অতএব সা‘ঈর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আদেশ মান্য করার নিয়ত করা ।

২- তাওয়াফের পরে সা‘ঈ করা। অতএব, তাওয়াফের আগে সা‘ঈ করা যাবে না।

৩- সাফা থেকে সা‘ঈ শুরু করা এবং মারওয়াতে শেষ করা।

৪- সাত চক্কর পূর্ণ করা।

৫-সা‘ঈর জন্য নির্ধারিত স্থানে সা‘ঈ করা। এর বাইরে না যাওয়া।

সা‘ঈর সুন্নতসমূহ:

১- তাওয়াফের সাথে সাথেই সা‘ঈ করা। তবে কোনো ওযর থাকলে ভিন্ন কথা। তখন পরেও সা‘ঈ করা যাবে।

২- সাফা ও মারওয়ায় উঠা। সা‘ঈর সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর ও বেশি বেশি দো‘আ পড়া।

৩- পুরুষের জন্য দুই সবুজ চিহ্নিত জায়গা সাধ্যানুযায়ী দ্রুত অতিক্রম করা। মহিলারা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবে।

---

[1] সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৭৬৪। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তবে সনদের খলিল ইবন উসমান রহ. এর জীবনী তিনি পান নি। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৭৩৬৭, আল্লামা শু‘আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি দ‘য়ীফ; কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় হাদীসটি হাসান।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সা'ঈর সময় পঠিত দো'আ হচ্ছে,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। সকল বিষয়ের ওপর তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন ও তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন"।[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি তিনবার পাঠ করেছেন।এর মাঝে তিনি নিজের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন।

সা'ঈর আদবসমূহ:

১- সাফার দরজা দিয়ে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে বের হওয়া:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨﴾ [البقرة: ١٥٨]

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয় শোকরকারী, সর্বজ্ঞ"। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৫৮]

২- পবিত্র অবস্থায় সা'ঈ করা।

৩- সা'ঈর সময় কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে হাঁটা। সম্ভব না হলে যেভাবে সম্ভব সেভাবে চলবে।

৪- বেশি বেশি যিকির ও দো'আ করা।

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

৫- মুসলিম ভাইয়ের সাথে কোমল আচরণ করা। কাউকে কথা ও কাজে কষ্ট না দেওয়া।

৬-সা‘ঈর সময় আল্লাহর সমীপে নিজেকে ছোট, অভাবী ও মুখাপেক্ষী মনে করা। নিজের হিদায়েত, নফসের তাযকিয়া ও সংশোধনের নিমিত্তে আল্লাহর কাছে নিজেকে বড়ই অভাবী মনে করা।

চতুর্থ রুকন: ‘আরাফাতের ময়দানে অবস্থান:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الحَجُّ عَرَفَةُ»

“হজ হচ্ছে ‘আরাফাতে অবস্থান।”[1]

‘আরাফাতের ময়দানে অবস্থান বলতে ৯ই যিলহজ যোহরের পর থেকে ১০ই যিলহজ ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের নিয়তে কিছুক্ষণ থাকা। কেউ ঈদের দিনের সূর্যোদয়ের আগে অবস্থান করতে না পারলে তার ‘আরাফাতের ময়দানে অবস্থান শুদ্ধ হবে না এবং বাতিল বলে গণ্য হবে।

হজের ওয়াজিবসমূহ:

১ - মিকাত থেকে ইহরাম করা।

২- যে ব্যক্তি দিনের বেলায় ‘আরাফাতে অবস্থান করবে তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘আরাফাতে অবস্থান করা।

৩- কুরবানীর রাত মুযদালিফায় যাপন করা।

৪- আইয়ামে তাশরীকে মিনার রাতগুলো মিনায় যাপন করা।

৫- কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৬- মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

৭- বিদায়ী তাওয়াফ।

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৮৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০১৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ফায়েদা:

উমরার রুকনসমূহ:

উমরার আরকান তিনটি। সেগুলো হলো:

১- ইহরাম বাঁধা।

২- তাওয়াফ করা।

৩- সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করা।

উমরার ওয়াজিবসমূহ:

উমরার ওয়াজিব দু'টি:

১- মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২- মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

কেউ উপরোক্ত রুকনের কোনো একটি ছেড়ে দিলে তার হজ ও উমরা আদায় হবে না। কারো হজ ও উমরার ওয়াজিব ছুটে গেলে তাকে ফিদিয়া তথা দম দিতে হবে এবং এর গোস্ত হারামের আশেপাশের মিসকিনকে দান করবে, নিজে এ গোস্ত খাবে না।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা:

১- তারবিয়ার দিনে করণীয়:

যখন তারবিয়ার দিন আসবে, আর তা হচ্ছে যিল-হজের ৮ম তারিখ, তখন তামাত্তু হজ পালনকারী হাজী, যিনি তাঁর উমরা থেকে হালাল হয়েছিলেন, তিনি যে স্থানে অবস্থান করছেন সে স্থান থেকেই চাশতের সময় ইহরাম বাঁধবেন, অতঃপর উমরার ইহরামের সময় যেসব কাজ করেছেন এখনও সেসব কাজ করবেন, অর্থাৎ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হবেন, গোসল করবেন, আতর লাগাবেন, ইহরামের কাপড় চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করবেন এবং হজের ইহরামের নিয়ত করে বলবেন,

«لبيك اللَّهُمَّ حجاً»[1]

“হে আল্লাহ, হজ আদায়ের জন্য আমি হাযির”।

ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করে নিবে যে, অসুস্থতা বা ভয়ভীতি কারণে যদি কোনো পারিপার্শ্বিক সমস্যা দেখা দেয় তাহলে সে ইহরাম ভঙ্গ করতে পারবে।[2] অতঃপর তালবিয়াহ পাঠ করবে।[3] তামাত্তুকারী যেখানে আছে সেখানে বসেই ইহরাম বাঁধবে, এমনকি মক্কাবাসীরাও মক্কার বাসা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। আর কারিন বা মুফরিদ হজকারী হলে সে মিকাত থেকে যে ইহরাম বেঁধেছে সে ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে।

২- এরপর সব হাজীরা মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। সেখানে গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব, ‘ইশা ও পরেরদিন ফজরের সালাত আদায় করবে। প্রতি সালাত তার সুনির্দিষ্ট সময়েই আদায় করবে। চার রাকা‘আতবিশিষ্ট সালাতগুলো কসর করে পড়বে। যিলহজের নয় তারিখ সূর্যোদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত মিনাতেই অবস্থান করবে। মিনাতে রাত যাপন করা সুন্নত। কোনো হাজী সেখানে রাত যাপন করতে না পারে তবে তাকে কোনো কিছু দিতে হবে না।

২- ‘আরাফাতের দিনে করণীয়:

---

[1] তামাত্তুকারী ইতোপূর্বে উমরার সময় বলেছিল, «لبيك اللَّهُمَّ عمرة أو عمرة متمعا بها إلى الحج» অর্থাৎ তিনি তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ আমি উমরার জন্য হাযির, অথবা হে আল্লাহ আমি উমরার জন্য হাযির যে উমরার সুযোগ নিয়ে আমি হজ করব।

[2] শর্ত করে নিয়ে বাঁধাগ্রস্ত বা অসুস্থ হলে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলা জায়েয এবং এর বিনিময়ে তাকে কিছুই দিতে হবে না। আর যদি শর্ত না করে এমতাবস্থায় ইহরাম ভঙ্গ করতে বাধ্য হলে তাকে দম দিতে হবে এবং পরের বছর হজ কাযা করতে হবে।

[3] উমরার ক্ষেত্রে ইহরাম থেকে শুরু করে তাওয়াফ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে। আর হজের ক্ষেত্রে ইহরাম থেকে শুরু করে ঈদের দিন বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া অব্যাহত রাখবে।

১- ৯ ই যিলহজ সূর্যোদয়ের পর হাজীগণ মিনা থেকে ‘আরাফার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। খুব ধীরস্থির ও ভাবগম্ভীর্যতার সাথে চলবে এবং তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। ‘আরাফার নির্দিষ্ট স্থান জেনে তার সীমা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সুবিধামত স্থানে অবস্থান করবে।

২- সেখানে গিয়ে সম্ভব হলে ইমামের সাথে যোহর ও আসরের সালাত যোহরের সময় পরপরএক আযান ও দুই ইকামতে কসর করে পড়বে।

৩- সালাতের পর যিকির, দো‘আ ও আল্লাহর কাছে কান্না-কাটি করার জন্য ফারেগ হয়ে যাবে। বিনয়ীভাব, উপস্থিত অন্তর ও কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দো‘আ করতে থাকবে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাজী সাহেবগণ তালবিয়া ও দো‘আ করা অবস্থায় ‘আরাফার ময়দানেই অবস্থান করবে। সূর্যাস্ত হলে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হবে। খুব ভাবগম্ভীর্য, প্রশান্তি ও শান্তভাবে মুযদালিফায় যাবে। আল্লাহর যিকির, ইসতিগফার ও তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবে।

৪- সূর্যাস্তের পূর্বে ‘আরাফার সীমানা ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘আরাফায় অবস্থান করেছেন। তিনি বলেছেন,

«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»

“যাতে তোমরা আমার থেকে হজের কার্যক্রম জেনে নাও”।[1]

কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে ‘আরাফা ত্যাগ করলে তাকে পুনরায় সেখানে ফিরে যেতে হবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। যদি ফিরে না যায় তাহলে গুনাহগার হবে এবং ফিদিয়া তথা দম দিতে হবে।

৫- কেউ সূর্যাস্তের পরে ‘আরাফায় গেলে সেখানে সামান্য সময় অবস্থান করলেই যথেষ্ট হবে। এমনকি ‘আরাফাতের ময়দান দিয়ে পেরিয়ে আসলেও নিয়তের কারণে ‘আরাফায় অবস্থান আদায় হয়ে যাবে। ঈদের দিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৭।

‘আরাফায় অবস্থানের সময়। কেউ ঈদের দিনের সূর্যোদয়ের পূর্বে ‘আরাফায় অবস্থান না করতে পারলে তার হজ বাতিল হয়ে যাবে। ইতোপূর্বে ইহরামের সময় সে যদি শর্ত করে থাকে যে, ‘যদি কোনো সমস্যা তাকে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বাঁধা দেয় তাহলে সেখানেই তার হজের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে’ তাহলে ঐ ব্যক্তি তখন ইহরাম খুলে ফেলবে এবং তাকে কোনো কিছু জরিমানা আদায় করতে হবে না। আর যদি এমন কোনো শর্ত না করে থাকে তাহলে সে উমরা পালনের মাধ্যমে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলবে। তখন সে বাইতুল্লাহ গিয়ে তাওয়াফ করবে, অতঃপর সা‘ঈ করবে, তারপরে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করবে। সঙ্গে হাদী থাকলে তা যবেহ করবে। পরের বছর ছুটে যাওয়া হজ কাযা করবে এবং হাদী নিয়ে আসবে। হাদী পাওয়া না গেলে দশদিন সাওম পালন করবে। তিনদিন হজের দিনে এবং বাড়ি ফিরে বাকী সাতদিন সাওম পালন করবে।

৩- মুযদালিফায় করণীয়:

১- মুযদালিফায় গিয়ে মাগরিব ও ‘ইশা একসাথে আদায় করবে। ‘ইশার সালাত কসর করে দু রাকা‘আত আদায় করবে। মুযদালিফায় রাত যাপন করবে। সূর্যোদয়ের কিছুসময় পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফাতেই অবস্থান করবে।

২- তবে মধ্যরাত হলে দুর্বল নারী, শিশু, বয়স্ক ও যারা এ ধরণের দুর্বল এবং যেসব শক্তিশালীরা বিশেষ খেদমতের প্রয়োজনবোধ করে তারা প্রয়োজনে মুযদালিফা থেকে মিনায় চলে যেতে পারবে। মিনায় পৌঁছার পর জামরায়ে ‘আকাবা তথা বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তাদের সাথে থাকা সুস্থ সবল লোকেরা সূর্যোদয়ের আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে না।

৩- সুস্থ সবল লোকেরা যাদের সাথে দুর্বল শ্রেণির কেউ নেউ, তারা মুযদালিফাতেই ফজর পর্যন্ত রাত যাপন করবে। সেখানে প্রথম ওয়াক্তে ফজরের সালাত আদায় করবে। অতঃপর সম্ভব হলে মাশ‘আরে হারামে যাবে। অতঃপর সেখানে যিকির ও দো‘আয় সূর্যোদয়ের কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত মশগুল থাকবে।

৪- সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা হবে।

৫- মধ্যরাতের পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা জায়েয হবে না। কেউ মধ্যরাতের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ফিরে না আসলে গুনাহগার হবে এবং তাকে ফিদিয়া তথা দম দিতে হবে। কেননা মুযদালিফায় রাত যাপন ওয়াজিব। আর রাতযাপনের সর্বনিম্ন সময় হলো মধ্যরাত পর্যন্ত সেখানে থাকা।

৬- কেউ মধ্যরাতের পরে মুযদালিফায় পৌঁছলে তার জন্য সামান্য সময় যাপন করলেও মুযদালিফায় অবস্থান হয়ে যাবে। এমনকি সে যদি মুযদালিফার ময়দান অতিক্রমও করে তবুও যথেষ্ট হবে।

৭- কেউ ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে মুযদালিফায় না পৌঁছে যদি ফজরের সময় সেখানে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করতে সক্ষম হয় আর ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ‘আরাফায় অবস্থান করে তবে তার হজ শুদ্ধ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ[1]»

“আমাদের এ সালাতে যে লোক শরীক হয়েছে, আমাদের সাথে ফিরে আসা পর্যন্ত অবস্থান করেছে এবং এর পূর্বে রাতে বা দিনে ‘আরাফাতে থেকেছে, তার হজ পূর্ণ হয়েছে এবং সে লোক তার অপরিচ্ছন্নতা দূর করে নিয়েছে”।[2]

৪- ঈদের দিনে করণীয়:

যিলহজ মাসের দশ তারিখ করণীয় কাজসমূহ:

---

[1] التفث অর্থ ময়লা-আবর্জনা ও অপরিচ্ছন্নতা। এর উদ্দেশ্য হলো মুহরিম হজের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে ইহরাম থেকে মাথার চুল মুণ্ডন বা ছোট করা, বোগল ও নাভির লোম উপড়ে ফেলার মাধ্যমে ময়লা- আবর্জনা থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৯১। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১- মুযদালিফা থেকে মিনায় পৌঁছার পর জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর মারার জন্য সাতটি কঙ্কর খোঁজে নিবে। যা মুযদালিফা থেকে নেওয়া যাবে অথবা পথ থেকেও নিতে পারবে। কঙ্করগুলো মটরশুঁটির চেয়ে একটু বড় হবে। অতঃপর যখন মিনায় পৌছবে তখন বড় জামরা, যা সর্বশেষ জামরা এবং মক্কার কাছাকাছি, সেটাকে লক্ষ্য করে সাতটি কঙ্কর মারবে। একটির পর একটি বিরতিহীনভাবে মারবে। প্রতিটি কঙ্করের সাথে হাত উঠাবে ও আল্লাহু আকবর বলে তাকবির দেবে। কঙ্কর নিক্ষেপে জামরার খুঁটিতে লাগানো শর্ত নয়; বরং খুটির চারপাশের গর্তে ফেললেই হবে। কেউ খুঁটিতে মারল কিন্তু গর্তে পড়ল না তখন সে কঙ্করের পরিবর্তে অন্য একটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। খুঁটিতে স্পর্শ না করেও যদি হাউজের মধ্যে পড়ে তাহলে সেটা যথেষ্ট হবে।

২- দশ তারিখ মধ্যরাত থেকে জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় শুরু হয় এবং সেদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় থাকে।

৩- জামরায় আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে হাদী যবেহ করবে, যদি হাদী যবেহ করা আবশ্যক হয়ে থাকে। তামাত্তু ও কারিন হজ পালনকারীর ওপর হাদী যবেহ করা আবশ্যক।

৪- ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে তেরো তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত যবেহ করার সময়। অর্থাৎ ঈদের দিন ও তারপরের তিনদিন দিনে বা রাতে যে কোনো সময় যবেহ করা জায়েয। তবে দিনে যবেহ করা উত্তম। এছাড়া মিনা বা মক্কার যেকোনো স্থানে যবেহ করা জায়েয। যদিও মিনায় যবেহ করা উত্তম; তবে মক্কায় যবেহ করলে যদি আলাদা কোনো উপকার ও সুবিধা থাকে তাহলে সেখানে যবেহ করা ভালো। হাজীর জন্য মুস্তাহাব হলো হাদীর গোশত নিজে খাওয়া, অন্যকে খাওয়ানো ও দান সদকা করা।

৫- হাদী যবেহ করার পরে মাথার চুল মুণ্ডাবে বা ছোট করবে। তবে চুল মুণ্ডানো উত্তম। আর মহিলারা চুলের বেণী থেকে এক আঙ্গুলের প্রথম কড় পরিমাণ চুল কেটে ফেলবে।

৬- জামরা আকাবার দিন কঙ্কর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করার মাধ্যমে ইহরাম থেকে প্রাথমিকভাবে নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়ে যাবে। তখন তার জন্য স্বাভাবিক কাপড় পরিধান, সুগন্ধি ব্যবহার, চুল কাটা, নখ কাটা ইত্যাদি জায়েয। তবে এ সময় স্বামী-স্ত্রীর মিলন হালাল হবে না, যতক্ষণ তাওয়াফে ইফাদা এবং সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ না করবে (তামাত্তু হজকারী হলে), অনুরূপ অন্য হজকারীর জন্যও, যদি ইতোপূর্বে তাওয়াফে কূদুমের সাথে সা'ঈ না করে থাকে।

৭- কঙ্কর নিক্ষেপ, হাদী যবেহ, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা শেষে সম্ভব হলে সেদিন হাজী মক্কায় ফিরে যাবে ও তাওয়াফে ইফাদা তথা হজ্বের ফরয তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। তামাত্তু হজকারী হলে সাফা-মারওয়ার সা'ঈও করবে। তামাত্তু' হজকারী না হলেও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করবে যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সা'ঈ করে না থাকে। ঈদের দিনে তাওয়াফে ইফাদা ও সা'ঈ করা উত্তম। ঈদের দিনের পরে করলেও কোনো অসুবিধে নেই।

৮- দশ তারিখ মধ্যরাত থেকে তাওয়াফে ইফাদার সময় শুরু হয় এবং এর কোনো শেষসীমা নেই। তবে আইয়ামে তাশরিকের মধ্যে সম্পন্ন করা উত্তম।

ঈদের দিনের আমলসমূহ সম্পর্কে সতর্কতা:

১- ঈদের দিনের কাজসমূহ নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন করবে:

ক- জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

খ- হাদী ওয়াজিব হলে হাদী যবেহ করবে।

গ- মাথা মুণ্ডাবে বা চুল ছোট করবে।

ঘ- তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করবে। আর তামাত্তু হজকারী সা'ঈ করবে। অন্য হজ আদায়কারী যদি পূর্বে ও সা'ঈ না করে থাকে তবে সা'ঈ করবে। এ তারতীবে করতে পারলে উত্তম। কিন্তু কেউ তারতীব ভঙ্গ করে একটির আগে অন্যটি করাও জায়েয। এতে কোনো অসুবিধে নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেদিনের কাজ আগে পরে করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন,

«افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»

“করো, কোনো ক্ষতি নেই”।[1]

২- প্রাথমিক হালাল তথা নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হওয়া, যা করলে মুহরিমের উপর থেকে ইহরামের কারণে আপতিত স্ত্রী সহবাস ব্যতীত যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে, তা নিম্নোক্ত তিন কাজের যে কোনো দু’টি কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়, জামরায়ে ‘আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথার চুল মুণ্ডানো অথবা ছোট করা, তাওয়াফুল ইফাদা ও সা‘ঈ করা (যার উপর সা‘ঈ বাকী আছে), আর যদি তিনটি কাজই সম্পন্ন করে তবে সে দ্বিতীয় হালাল তথা চূড়ান্তভাবে নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়ে যাবে, তখন তার জন্য স্ত্রীসহ সবকিছু হালাল হয়ে যাবে।

৩- কুরবানীর জন্য যেসব পশু উপযোগী সেসব পশু দ্বারাই হাদী করা জায়েয। অর্থাৎ শরী‘আতসম্মত বয়স হওয়া। মেষশাবকের ছয়মাস, ছাগলের একবছর, গরুর দুবছর, উটের পাঁচবছর। এছাড়া পশুটি দোষত্রুটিমুক্ত হতে হবে, যেমন: অসুস্থ, অতিবয়স্ক, অতিদুর্বল, কানা, অন্ধ, খোড়া ও অঙ্গহীন না হওয়া।

৪- তামাত্তু‘ ও কারিন হাজীর ওপর হাদীর পরিমাণ হচ্ছে, কমপক্ষে একটি ছাগল বা উট অথবা গরুর সাত ভাগের একভাগ।

৫- কেউ হাদী যবেহ করতে না পারলে তাকে হজের দিনগুলোতে তিনদিন এবং বাড়ি ফিরে আসলে বাকী সাতদিন সাওম পালন করতে হবে। আইয়ামুশ তাশরিকের দিনেও (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) তিনটি সাওম পালন করা যাবে। কেননা ‘আয়িশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ও ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন,

«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩০৬।

“যাঁর নিকট হাদীর পশু নেই তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সাওম পালন করার অনুমতি দেওয়া হয় নি”।[1]

উমরার ইহরামের পরেও সাওম পালন করতে পারে; তবে ঈদের দিন ও ‘আরাফার দিনে সাওম পালন করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদ ও ‘আরাফায় বসে ‘আরাফার দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[2]

৫- আইয়ামুশ তাশরিকের দিনে করণীয়:

আইয়ামুশ তাশরিক বলতে যিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। এ দিনগুলোতে করণীয় কাজ হলো দু’টি:

১- এ দিনগুলোতে মিনায় রাত যাপন করবে। মিনায় আইয়ামুশ তাশরিকের রাত যাপন করা হজের অন্যতম একটি ওয়াজিব। কেউ ওযর ব্যতীত মিনায় রাত যাপন না করলে তাকে দম দিতে হবে। রাত যাপনের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো সাধ্যানুযায়ী রাতের অধিকাংশ সময় মিনায় অবস্থান করা; চাই তা রাতের প্রথমভাগে হোক বা শেষভাগে। যেমন কেউ রাতের প্রথম ভাগে মক্কায় গেল, অতঃপর রাতের মধ্যভাগের আগেই ফিরে আসল অথবা মধ্যরাতের পরে মিনা ত্যাগ করল, তাহলে কোনো অসুবিধে হবে না। কেননা সে তার ওপর অর্পিত ওয়াজিব আদায় করেছে।

২- এ তিন দিনে তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। আর এ দিনগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হচ্ছে সূর্য হেলে যাওয়া।

- সুতরাং (সূর্য হেলে যাওয়ার পর) প্রথমে ছোট জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। যে জামরাটি মক্কা থেকে দূরে আর মাসজিদে খাইফের সন্নিকটে। প্রতি জামরায় সাতটি কঙ্কর বিরামহীনভাবে মারবে এবং প্রতি কঙ্করের সাথে

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৯৭।

[2] সাওম অধ্যয়ে যেসব দিন সাওম পালন করা হারাম ও মাকরূহ সেখানে এ কথা দলীল পেশ করা হয়েছে।

তাকবির দেবে। অতঃপর সামান্য সামনে এগিয়ে গিয়ে সাধ্যমত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে দো‘আ করবে।

- এরপরে মধ্য জমরায় পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতি কঙ্করের সাথে তাকবীর দিবে, তারপর বাম দিকে এগিয়ে যাবে এবং কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করবে।
- অতঃপর বড় জামরায় গিয়ে একইভাবে পরপর প্রতিটি কঙ্করের সাথে তাকবীরসহ সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এরপরে ফিরে আসবে কিন্তু দো‘আ করবে না। প্রতি জামরায় তারতীব বজায় রাখা ওয়াজিব। প্রথমে ছোট জমরায়, অতঃপর মধ্য জামরায় এরপর বড় জমরায়। এ দিনগুলোতে প্রতি ওয়াক্ত সালাত স্বাভাবিক নিয়মে আদায় করবে। জমা ও কসর করবে না।

১২ ও ১৩ তারিখ পূর্বের দিন যেভাবে কঙ্কর মেরেছে ঠিক সেভাবেই তিন জামরায় কঙ্কর মারবে। যদি দ্রুত মিনা ত্যাগ অর্থাৎ বারো তারিখেই মিনা ত্যাগের ইচ্ছা থাকে তাহলে সেদিন সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা থেকে বের হয়ে যেতে হবে। আর যদি তেরো তারিখেও কঙ্কর মারার ইচ্ছা থাকে তবে বারো তারিখ দিবাগত রাত মিনাতেই যাপন করতে হবে। তাড়াহুড়া না করে মিনায় তিনদিন অবস্থান করা উত্তম। স্বাভাবিকভাবে হাজী সাহেবের জন্য এ দু’টি কাজের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। তবে যদি মিনায় থাকা অবস্থায় বারো তারিখের সূর্য ডুবে যায় তবে তার ওপর তখন সেখানে অবস্থান করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

বিদায়ী তাওয়াফ:

হজপালনকারী মক্কা ত্যাগের ইচ্ছা করলে বিদায়ী তাওয়াফের জন্য মক্কায় যাবে এবং সাত চক্কর দিয়ে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করবে, তবে সা‘ঈ করবে না। এ তাওয়াফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»

“শেষবারের মতো বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ যেন প্রস্থান না করে”।[1]

তবে হায়েয ও নিফাসবতী মহিলারা মক্কাত্যাগ করলে তাদের বিদায়ী তাওয়াফ নেই। তবে বিদায়ের আগে তারা পবিত্র হলে বিদায়ী তাওয়াফ করে যেতে হবে।

উমরার সারসংক্ষেপ

১- ইহরাম বাঁধা: উমরাকারী যখন মিকাতে পৌঁছবে, সে পূর্বে উল্লিখিত ইহরামের সময়কার মুস্তাহাব কাজগুলো সম্পন্ন করে ইহরামের উত্তম কাপড় পরিধান করবে এবং উমরার নিয়ত করবে এবং বলবে: لبيك عمرة (হে আল্লাহ আমি উমরার জন্য হাযির)। অতঃপর উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে ও বলবে: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» “আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির, আমি হাযির। আপনার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নি‘আমত আপনার এবং রাজত্বও, আপনার কোনো শরীক নেই”।

২- তাওয়াফ: মক্কায় পৌঁছে মসজিদে হারামে যাবে এবং কা‘বাঘরের সাত চক্কর তাওয়াফ শুরু করবে। হাজরে আসওয়াদ দিয়ে শুরু করে হাজরে আসওয়াদেই শেষ করবে। তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে - যদি সম্ভব হয়- দু রাকা‘আত সালাত পড়বে।

৩- সা‘ঈ: এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে যাবে। সাফা পাহাড়ের দিকে উঠার নিকটবর্তী হলে কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি পড়বে:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]

“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৮]

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩২৭।

সাফা পাহাড়ে উঠবে। কিবলামুখী হবে। দু হাত উঠাবে। তাকবীর দেবে ও আল্লাহর প্রশংসা করবে। বলবে:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

“আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। সকল বিষয়ের ওপর তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন ও তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন”।[1]

এরপর নিজের প্রার্থনা আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করবে। এরপর উল্লিখিত দো‘আটি দ্বিতীয়বারের মতো পড়বে। এরপর আবার নিজের প্রার্থনা আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করবে ও তৃতীয় বারের মতো উল্লিখিত দো‘আটি পড়বে। সাফা থেকে নেমে মারওয়ার পথে রওয়ানা হবে। দুই সবুজ চিহ্নের মাঝে দ্রুতপদে ধাবমান হবে। মারওয়ায় উঠবে এবং সাফায় যেভাবে দো‘আ প্রার্থনা করেছে, একইরূপে মারওয়াতেও করবে। সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সা‘ঈ করবে। সাফা ও মারওয়ার চক্কর হচ্ছে সাতটি। যাওয়া একটি আর ফিরে আসা আরেকটি চক্কর বিবেচিত হবে।

৪- মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা: সা‘ঈ করার পর পুরুষ তার মাথার চুল মুণ্ডাবে বা ছোট করবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উমরার যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হয়ে যাবে।

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

হজের সারসংক্ষেপ

১- যিলহজের আট তারিখ হাজী যে স্থানে অবস্থান করছে সে স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে, ইহরামের কাপড় পরিধান করবে এবং হজের নিয়ত করে বলবে:

« لبيك اللَّهُمَّ حجاً »

“হে আল্লাহ, হজ আদায়ের জন্য আমি হাযির।

এরপর মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। সেখানে গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব, ‘ইশা ও পরের দিন ফজরের সালাত আদায় করবে। প্রতি সালাত তার সুনির্দিষ্ট সময়েই আদায় করবে। তবে চার রাকা‘আত বিশিষ্ট সালাত কসর করে পড়বে।

২- যিলহজের নয় তারিখ সূর্যোদয়ের পর ‘আরাফার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। ‘আরাফায় গিয়ে একই আযান ও দু ইকামতে যোহর ও আসরের সালাত যোহরের সময় পরপর কসর করে পড়বে। তবে সে আরাফার সীমানায় আছে কি না তা নিশ্চিত হতে হবে।

৩- সূর্যাস্ত সম্পন্ন হলে শান্তভাবে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হবে। মুযদালিফায় গিয়ে একই আযান ও দু ইকামতে মাগরিব ও ‘ইশার সালাত একসাথে আদায় করবে। ‘ইশার সালাত কসর করে দু রাকা‘আত আদায় করবে। তারপর মুযদালিফায় অবস্থান করে রাত যাপন করবে। সেখানে ফজরেরে সালাত আদায় করবে এবং মাশ‘আরে হারামের কাছে যিকির ও দো‘আয় মশগুল থাকবে। তবে সমস্যাগ্রস্তদের জন্য মধ্য রাত্রির পর সেখান থেকে চলে যাওয়া বৈধ।

৪- ঈদের দিনে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা হবে। মিনায় পৌঁছার পর জামরায়ে আকাবা তথা বড় জামরায় যাবে। বড় জামরাকে লক্ষ্য করে সাতটি কঙ্কর মারবে। একটির পর একটি বিরতিহীনভাবে মারবে। প্রতিটি কঙ্করের সাথে তাকবির দেবে।

৫- ঈদের দিন ও এরপরের তিনদিন মিনা বা মক্কায় হাদী যবেহ করবে যদি হাদী যবেহ করা আবশ্যক হয়ে থাকে। হাদীর গোশত নিজে খাবে, হাদীয়া দিবে ও দান করবে। হাদী আবশ্যক হওয়া সত্বেও যবেহ করার সামর্থ্য না থাকলে হজের তিনদিন সাওম পালন করবে এবং বাড়ি ফিরে বাকী সাতদিন সাওম পালন করবে।

৬- অতঃপর মাথার চুল মুণ্ডাবে অথবা ছোট করবে। এ সবের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়ে যাবে, অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যতীত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ অন্যসব বিষয় হালাল হয়ে যাবে।

৭- এরপর মক্কায় ফিরে যাবে ও তাওয়াফে ইফাদা তথা হজের ফরয তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। তামাত্তু হজকারী হলে সাফা-মারওয়ার সা‘ঈও করবে। তামাত্তু হজকারী না হলেও সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ করবে যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সা‘ঈ করে না থাকে। এর মাধ্যমে হাজী পূর্ণাঙ্গরূপে নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়ে যাবে। এটা সম্পন্ন করার পর তার জন্য ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সকল বিষয় হালাল হয়ে যাবে; এমনকি স্বামী-স্ত্রী সহবাসও হালাল হয়ে যাবে।

৮- এরপর মিনায় ফিরে আসবে এবং সেখানে আইয়ামুত তাশরিকের দিনগুলোর রাত যাপন করবে। প্রতিদিন ছোট, মধ্যম, বড় এ তিন জামরার প্রতিটিতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

৯- মক্কা ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে বিদায়ী তাওয়াফের জন্য মক্কায় যাবে এবং সা‘ঈ ব্যতীত মক্কায় সাত তাওয়াফ করে সাথে সাথে বিদায় নিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজের বিবরণ

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন,

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿ ۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ ١٥٨ ﴾ [البقرة: ١٥٨] «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ

آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» مَرَّتَيْنِ «لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ قُلْتُ: اللهُمَّ، إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ،

فَقَالَ: «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর মদিনায় অবস্থান করেন এবং এ সময়কালের মধ্যে হজ করেন নি। অতঃপর দশম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হজে যাবেন। মদিনায় বহুলোকের আগমণ হলো। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে এবং তার অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিলো। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থাস্থানে পৌছলাম, আসমা বিনত উমায়স রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মুহাম্মাদ ইবন আবু বকরকে প্রসব করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন এখন আমি কি করবো? তিনি বললেন, তুমি গোসল করো, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর "কাসওয়া" নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অতঃপর বায়দা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য, কতক সওয়ারীতে; কতক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডান দিকে, বাম দিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তার ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন, আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এ তালবিয়া পাঠ করলেন: 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা না শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাক'। অর্থ: "আমি তোমার দরবারে হাযির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে হাযির, তোমার কোনো শরীক নাই, আমি তোমার দরবারে

উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নি‘আমত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই”। লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করল যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে বেশি কিছু বলেন নি। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা হজ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করি নি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সঙ্গে বাইতুল্লাহতে পৌঁছলাম, তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, তারপর সাতবার কা‘বা ঘর তাওয়াফ করলেন; তিনবার দ্রুতগতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى﴾ [البقرة: ١٢٥]

“তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থাস্থানরূপে গ্রহণ কর” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৫]। তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে দু’রাকা‘আত সালাত আদায় করলেন। (জাফর রহ. বলেন, আমার পিতা (মুহাম্মাদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু’রাকা‘আত সালাতে ‘সূরা কুল হুআল্লাহু আহাদ’ ও ‘কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন’ পাঠ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাতে চুমো খেলেন। তারপর তিনি দরজা[1] দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]

---

[1] অর্থাৎ বনী মাখযূম এর দরজা। যা সাফা দরজা নামেও খ্যাত। কারণ তা সাফা পাহাড়ের কাছে।

“নিশ্চয় সাফা-মারওয়া আল্লাহর দু’টি নিদর্শনসমূহের অন্যতম”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৮] এবং আরো বললেন, আল্লাহ তা‘আলা যে পাহাড়ের উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন, আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করবো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তারপর এতটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন, আল্লাহর একত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন এবং বললেন, «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

“আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন”। তিনি এ দো‘আ পড়লেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার বলেছেন। প্রতিবারের মাঝখানে দো‘আ করেছেন।

অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন- যখন তাঁর পা মুবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকলো তখন তিনি দ্রুত চললেন, যতক্ষণ যাবত না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন। অতঃপর এখানেও তাই করলেন যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। সর্বশেষ তাওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌছলেন, তখন (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন, যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশুও আনতাম না এবং হজের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। এ সময় সুরাকা ইবন মালিক ইবন ‘জু‘শুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আংগুলগুলো

পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন এবং দু'বার বললেন, উমরা হজের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরও বললেন, না; বরং সর্বকালের জন্য, সর্বকালের জন্য।
এ সময় আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইয়েমেন থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছে, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গিন কাপড় পরিহিত ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইরাকে থাকা অবস্থায় বলতেন, অতপর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা যা করেছেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম যে, আমি তার এ কাজ অপছন্দ করেছি। তিনি যা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে জানার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতিমা সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। তুমি হজের ইহরাম বাঁধার সময় কী বলেছিলে? আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) আছে, অতএব, তুমি ইহরাম খুলবে না। জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইয়েমেন থেকে যে পশুরপাল নিয়ে এসেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গে করে যে সব পশু নিয়ে এসেছিলেন, সর্বসাকুল্যে এর সংখ্যা দাঁড়ালো একশত। অতঃপর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেললেন এবং চুল কাটলেন। তারপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ) আসল। লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধল এবং মিনার দিকে রওনা হলো। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাহনে সাওয়ার হয়ে

গেলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, 'ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। নামিরা নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রওনা হয়ে গেলেন। কুরাইশগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহেলী যুগে কুরাইশগণ করতো। কিন্তু তিনি সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে 'আরাফাতে পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর কাসওয়া (নামক উষ্ঠী) কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগান হলো। তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন: "তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম যেমন তা হারাম তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে"। সাবধান! জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নীচে। জাহেলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো। আমি সর্ব প্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের রবী'আ ইবন হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানু সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল। তখন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলী যুগের সুদও বাতিল হলো। আমি প্রথমে যে সুদ বাতিল করছি তা হলো আমাদের বংশের আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হলো। তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এ যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোনো লোককে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে তবে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের ওপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছেদের

হুকুম রয়েছে। আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কি বলবে?” তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, “ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, তিনি তিনবার এরূপ বললেন। তারপর (মুয়াযযিন) আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এ দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোনো সালাত আদায় করেন নি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ার হয়ে মাওকিফ (অবস্থানস্থল) এ এলেন, তাঁর কাসওয়া উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তূপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র হওয়ার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে অবস্থান করলেন। হলদে আভা কিছু দূরীভূত হলো; এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলো। উসামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে তাঁর বাহনের পেছন দিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাকের দড়ি সজোরে টান দিলেন- ফলে তার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লান্তি অবসাদের জন্য যাতে পা রাখে) স্পর্শ করল। তিনি ডান হাতের ইশারায় বলেন, হে মানবমণ্ডলী! ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও। যখনই তিনি বালুর স্তূপের নিকট পৌঁছতেন, কাসওয়ার নাকের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাতে সে উপরদিকে উঠতে পারে। এভাবে মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ‘ইশার সালাত আদায় করলেন। এ সালাতের মাঝখানে অন্য কোনো নফল সালাত আদায় করেন নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে পড়লেন যতক্ষণ যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হলো। অতঃপর ভোর হয়ে গেলে

তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে মাশ‘আরে হারাম নামক স্থাস্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দো‘আ করলেন, তার মহাত্ম্য বর্ণনা করলেন, কালেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওনা করছিলেন এবং ফযল ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসলেন। তিনি ছিলেন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অগ্রসর হলেন- পাশাপাশি একদল মহিলাও যাচ্ছিলো। ফযল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত ফযলের চেহারার ওপর রাখলেন এবং তিনি তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ফযল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অপরদিক থেকে দেখতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় অন্যদিক থেকে ফযল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। তিনি আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। “বাতনে মুহাসসার- নামক স্থানে পৌছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন, যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার ‘আল্লাহু আকবার’ বললেন। অতঃপর সেখান থেকে কুরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টী পশু যবেহ করলেন। তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বাকীগুলো যবেহ করতে বললেন এবং তিনি তাকে কুরবানীর পশুতে শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর গোশতের কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হলো। তারা উভয়ে এ গোশত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ার হয়ে

বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যোহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বনু আব্দুল মুত্তালিব-এর লোকদের কাছে আসলেন, তারা লোকদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিলো। তিনি বললেন: হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোলো। আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিলো এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন”।[1]

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

মসজিদে নববী যিয়ারত

মসজিদে নববী যিয়ারত সুন্নত। এর কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। হজের রুকন, শর্ত অথবা ওয়াজিবের মধ্যে শামিল নয়। এটি হজের কোনো পরিপূর্ণতাও নয়; বরং যিয়ারত করা সুন্নত। কেউ হজ পালন করতে এসে মসজিদে নববী যিয়ারত করতে সক্ষম না হলেও তার হজ পূর্ণ ও সহীহ হবে। মসজিদে নববী যিয়ারত করার কতিপয় আদব রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলো হলো:

১- মদীনা ও মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্য হতে হবে মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর যিয়ারত উদ্দেশ্য হলে শুদ্ধ হবে না। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত মসজিদে নববী যিয়ারতের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এজন্য আলাদা নিয়ত করার প্রয়োজন নেই।

২- যখন যিয়ারতকারী মসজিদে নববীতে পৌঁছবে, ডান পা আগে দেবে ও বলবে,

«بِسْمِ اللَّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

"আল্লাহর নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন"।[1]

৩- তাহিয়াতুল মসজিদের দু রাকা'আত সালাত আদায় করবে। এ দু রাকা'আত রওজাতুল জান্নাতে পড়তে পারলে ভালো। যে জায়গাটি রাসূলের কক্ষ ও মিম্বারের মাঝখানে অবস্থিত।

৪- নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর, তার দুই সাথী আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার কবরে সালাম দিবে। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট শব্দ নেই। যদি বলে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ

---

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৭৭১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহূ আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত পেশ করে, তারপর তাঁর দু' সাথীর উপর সালাম দেয় এবং তাদের জন্য দো'আ করে তবে তা ভালো।

৫- দো'আ করতে চাইলে কবর থেকে দূরে সরে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার চাইবে। এভাবে মসজিদে নববী যিয়ারত সম্পন্ন করবে।

৬- যিয়ারতকারীর জন্য আরো মুস্তাহাব হলো মসজিদে কুবায় সালাত আদায় করা এবং বাকী' ও অহূদের শহীদদের কবর যিয়ারত করা।